শয়নে স্বপনে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

স্নেহের
আবুল বাশারকে

শয়নে স্বপনে

পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। সামনে সিঁথি। তেল চুকচুকে জামাই জামাই চেহারা। বকবক করে বকতে ভালবাসে। বেশির ভাগ কথাই বোকা বোকা। একটা হামবড়াই ভাব। স্বজাতির নিন্দায় পটু। অন্যের ভাল দেখলে নিজের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। বিপদে পড়লে ভাই ভাই, বিপদ কেটে গেলে, তুমি কে ভাই। বাঙালিকে খুব সহজেই চেনা যায়। বাঙালির চোখে-মুখে একটা ভেতো আলস্যের ভাব লেগে থাকে। সর্দিপ্রবণ। পেট পাতলা, মুখ হলসা, স্ত্রীর ন্যাওটা, এক কথায় বাঙালিকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। ওগো, হ্যাঁ গো, শুনছো, থেকে থেকে ছেলেকে শাসন, ছেলের ডাক নামে অবশ্যই একটা বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেমন, ডাম্বেল, বারবেল, কিমা, বাম্পা, ভোম্বা, লেংটি, বুড়ো, টোকোন, ছোকন, লক্কা, নটে, নটাই। যাবতীয় অদ্ভুত শব্দে পুত্র-কন্যাকে ডেকে বাঙালির স্বর্গীয় আনন্দ। প্রকাশ্য স্থানে, রাস্তায়, দোকানে, স্টেশানে, ট্রেনের কামরায়, বিয়ে বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে এই ভাব, এই ধুম ঝগড়া, বাঙালির খোকা প্রকৃতির বিশিষ্ট পরিচয়। বেগ আর আবেগ দুটোই প্রবল। প্রকাশ্য স্থানে প্রাকৃতিক কর্মে লজ্জা নেই, লজ্জা নেই পরিবারের সঙ্গে চুলোচুলি অথবা সোহাগে।

কিন্তু! এর মধ্যে একটা বড় কিন্তু আছে। বাঙালির মন। তার একটা তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙালি বাইরে নেই। সে-বাঙালির মৃত্যু হয়েছে। বাঙালি আছে ভেতরে। মনে বাঙালি, বিশ্বাসে, সংস্কারে বাঙালি।

পোশাকে-আশাকে, ভাষায়, আচরণে বাঙালি নিজেকে প্রকাশ করতে লজ্জা পায়; কারণ, বাঙালি আজ সব চেয়ে ঘৃণিত জাতি।

যত মোম্বাই নিজের টেরিটরিতে। সীমানার বাইরে আর কোনো ইজ্জত নেই—ভাগ শালা বাঙালি। অনেক স্টেটে হাতি-খেদার মতো

বাঙালি-খেদা আন্দোলন শুরু হয়েছে। এর অনেক কারণ আছে। বাঙালি অনুকরণ প্রিয়, কর্তাভজা ক্লাসের প্রাণী। ইংরেজরা এই 'ল্যাকি'দের ভালই কাজে লাগিয়েছিল। নে বুটের ফিতে বাঁধ, আয় সেরেস্তায় বোস, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, হুঁকাবরদার, মোসায়েব, চামচা, টিকটিকি, সব বাঙালি। একটু নেকনজর, সামান্য মহাপ্রসাদ, অল্প-স্বল্প খেতাব, প্রমোশান, বাঙালির সে কি নৃত্য। দত্ত হয়ে গেল দুতা বা ডুটা, মিত্র হয়ে গেল মিটার, বোস হয়ে গেল ভোঁস, দাস হয়ে গেল ডস, হরি হয়ে গেল হ্যারি। শিক্ষিত বাঙালির ধারণাই হল, বাঙালি অতি নিকৃষ্ট জাতি। বাঙালি বলে পরিচয় দেওয়াটাও পাপ। ভাষা ভোলো, জাত ভোলো, আচার-আচরণ ভোলো। সাহেব হয়ে যাও। বাঙালিকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বহু ভাবে, বহু দিক থেকে নিরীক্ষণ করেছিলেন। বলছেন—'পিলে রোগী দেখেছি, কালাপেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে। কেউ বুট পরেছে অমনি মুখে ইংরাজী কথা বেরুচ্ছে।' আর একটু বিস্তারিত বলছেন—'এক-একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার 'নিধুর টপ্পার' তান এসে জোটে, আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি এইসব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মতো লাফিয়ে উঠতে থাকে।' এই উপাধিই হয়েছিল, বাঙালির মহাকাল। সায়েবদের সঙ্গে স্কন্ধ ঘর্ষণ। ইংরেজিটা চট জলদি শিখে ফেলা। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে—হ্যাট, গ্যাট, ম্যাট। তোষামোদ। চাটুকারিতা। কেউ হলেন রায়বাহাদুর, কেউ হলেন দেওয়ান, কেউ হলেন নাইট। বাঙালির কানে এল—হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টু-ডে, ইণ্ডিয়া থিংকস টু-মরো। বাঙালির লাঙুল স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত ফুলে একেবারে চামরের মতো হয়ে রইল। বাঙালিই হল সব। যেমন লিকার, তেমনি ফ্লেভার। বাঙালির

মেধা, বাঙালির জ্ঞান, বাঙালির শিল্প, বাঙালির ব্যবসা, বাঙালির বক্তৃতা, সংস্কৃতি, স্বদেশ-চেতনা, অ্যাডমিনস্ট্রেশন, একেবারে মার কাটারি ব্যাপার। শিক্ষিত বাঙালি, এক নম্বর মাল। সে কি অহংকার। সে কি দুর্ব্যবহার! মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না। এক বাঙালি আর এক বাঙালিকে সহ্য করতে পারে না। আমি। আমিই সব। দ্বিজেন্দ্রলাল হালচাল দেখে মারলেন খোঁচা—"আমরা বিলাত ফের্তা ক'ভাই / আমরা সাহেব সেজেছি সবাই / তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার / করিয়াছি সব জবাই / আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি / আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি / আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা'—আর / মুটেদের ডাকি 'কুলি' / রাম, কালীচরণ, হরিচরণ নাম, এ সব সেকেলে ধরন / তাই নিজেদের সব ডে রে ও মিটার করিয়াছি নামকরণ।"

সেই বাঙালি সায়েবরা চলে যাবার পর হয়ে গেল মুরুব্বি হারা অসহায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে চাঁট খেতে খেতে, সরতে সরতে এখন 'কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর।' সে কি? শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে হাত বাড়াই। রসিকপ্রবরের ঝুলিতে আমাদের আত্মদর্শন ছিল। তিনি বলছেন—'এক-একজন বাড়িতে পুরুষ থাকে,—মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়। নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বঠ্‌ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দুখানা করে দেবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর।'

ভারতবর্ষে বাঙালি এখন কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর। অন্য প্রদেশে কোনো সম্মান নেই। ঘৃণার নাম বাঙালি; কারণ সর্ব অর্থে অপদার্থ। নিজের রাজ্যে বাঙালির এখন দুটো ক্লাস, বক্তা আর শ্রোতা। বন্ধুগণ, বলে একবার শুরু করলে আর রক্ষা নেই। ভিক্ষি

মেরে মেরে বক্তৃতা। সে কি ফোর্স। এদিকে পেছনের কাপড় খুলে নিয়ে গেল অন্য স্টেট। নামের প্যাড আর ভিজিটিং-কার্ড ছাড়া বাঙালির কিছু রইল না। শেয়াল পণ্ডিতের কুমিরছানা দেখানোর মতো, কয়েকজন মহাপুরুষকে বারে বারে দেখাতে দেখাতে আর কোনও কাজ হচ্ছে না। কোনো শ্রদ্ধাই আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কাজের বাঙালি, প্রতিষ্ঠিত বাঙালি, প্রাণের দায়ে, অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে বহুরূপী সাজতে বাধ্য হচ্ছেন। বাঙালি বলে যেন চিনে না ফেলে, তাহলে আর করে খেতে হবে না। অপদার্থ, আত্মম্ভর, পেছনে লাগা, কুচুটে বাঙালিকে কেউ চায় না। সব অচল করে দেবে। মেরে ফাঁক করে দেবে। প্রমাণ, তার নিজের রাজ্য। কি অপূর্ব অবস্থা! সব এলোমেলো। সম্পূর্ণ অচল। সম্প্রতি নতুন এক ভিরকুটি এসে জুটেছে—পদযাত্রা, মানবশৃঙ্খল, মহামিছিল আর বন্ধ। বাঙালি! তুমি কাজের কাজ কি করো ভাই? পদযাত্রা করি। আর কি করো ভাই? ঝাণ্ডা মেরে কারখানা বন্ধ করে, নর্দমার ধারে চৌকি পেড়ে বছরের পর বছর তাস পিটি। আর কি করো ভাই? বারোয়ারি পুজো করি।

অতিশয় করুণ অবস্থা! বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলার মতো আর কিছু নেই। যা প্রায় সব জাতেরই আছে। আমি জার্মান, আমি ফরাসি, জাপানি আমি, আমি ইংরেজ। আমি কিন্তু বাঙালি নই। নিজেকে আমি লুকোবার চেষ্টা করি। কারণ বাঙালি শব্দটা এখন গালাগালি। পয়সাঅলা অবাঙালি শিল্পপতি বলবেন—আরে ব্যাটা বাঙালি। বাঙালি এখন সার্ভেন্ট ক্লাস। বাঙালি নিজের অবস্থা বোঝে। বাঙালি তো নির্বোধ নয়। আর বোঝে বলেই, ক্রোধ আর হতাশায় আত্মঘাতী। নিজেরাই নিজেদের কোতল করছে যদুবংশের মতো। পরস্পর পরস্পরের কাছা ধরে টানছে। কাকের মতো ঠোকরাচ্ছে। নিজেরা এগোতে পারছি না বলে, অন্যকেও এগোতে দেবো না। একটা মারকুটে নরঘাতী ভাবমূর্তি তৈরি করে সকলকে ভয় দেখাচ্ছি।

অথচ বাঙালি মন ঠিক ওই রকম নয়। বাঙালির বাঙালিয়ানা হল তার মন। বহু বছরের সংসারে তৈরি হয়েছে বাঙালি মন। ধর্মের প্রভাব পড়েছে। বৌদ্ধধর্ম, চৈতন্যধর্ম, আউল-বাউল-সহজিয়া। একদিকে শাক্ত আর একদিকে বৈষ্ণব বাঙালির মনে বসে আছে। বাঙালি-মনকে নাড়া দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মন ও মননকে পরিচ্ছন্ন করেছেন। ইন্টেলেকচ্যুয়াল করেছেন। বাঙালির মন স্বভাবতই উদার। বাঙালি বন্ধুবৎসল, অতিথিবৎসল। খেয়ে ও খাইয়ে আনন্দ পায়। বাঙালি বুদ্ধিমানের ভাব করে; কিন্তু আসলে অতিশয় বোকা। বোকা না হলে প্রেমিক হয় না। বোকা না হলে খেয়ে আর খাইয়ে ফতুর হবে কেন? বোকা না হলে এ-রাজ্যে গুরুবাদ এমন জাঁকালো হত না। মোড়ে মোড়ে জ্যোতিষীদের এত রমরমা হত না। বাঙালির মনে এক ধরনের লোভ-মিশ্রিত বিশ্বাস আছে, যার ফলে বাঙালির মতো কেউ অ্যাতো ঠকে না। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে—সারা ভারতে একমাত্র বাঙালিই ঠকতে আর ঠকাতে ওস্তাদ। বহুকাল আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙালি চরিত্রের এই দিকটি ধরে ফেলেছিলেন—ডমরুধর দুর্গাপুজো করেছেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়ে বলছেন—বর প্রার্থনা করো। ডমরু বর চাইছেন—"মা! সুন্দরবনে আমার আবাদে মৃগনাভি হরিণের চাষ করিবার নিমিত্ত স্বদেশী কোম্পানী খুলিব মনে করিতেছি। ভেড়ার পালের ন্যায় বাঙ্গালার লোক যেন টাকা প্রদান করে, আমি এই বর প্রার্থনা করি।"

দেবী বলিলেন—"কৈলাস পর্বতের নিকট তুষারাবৃত হিমাচলে কস্তুরী হরিণ বাস করে। সুন্দরবনে সে হরিণ জীবিত থাকিবে কেন?" আমি বলিলাম—'যে কাজ সম্ভব, যে কাজে লাভ হইতে পারে, সে কাজে বাঙ্গালী বড় হস্তক্ষেপ করে না। উদ্ভট বিষয়েই বাঙ্গালি টাকা প্রদান করে।'

ত্রৈলোক্যবাবু আর এক জায়গায় লিখছেন—একটি তুখোড় বাঙালি যুবক ডমরুধরকে ব্যবসার প্রস্তাব দিচ্ছে। তার এক হাতে এক রাশ এঁটেল মাটি আর এক হাতে চার পাঁচ খানা ধবধবে চিক্কণ কাগজ। ব্যাপারটা কি? ছেলেটি বললে—'এঁটেল মাটি হইতে আমি এই কাগজ প্রস্তুত করিয়াছি। এক টাকার এঁটেল মাটি হইতে দশ টাকার কাগজ হইবে। নয় টাকা লাভ থাকিবে।' ডমরুধর বলছেন—'ভাবিলাম যে, এ কাজ হালাগুলো বাঙ্গালীর উপযুক্ত বটে। দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে।'

এই হল বাঙালি মন। সন্দেহপ্রবণ, যুক্তিবাদী কিন্তু উদ্ভটরসে, অবাস্তব প্রস্তাবে, অলৌকিকে বিশ্বাসী। ঠকবে, সর্বশান্ত হবে, তবু এগিয়ে যাবে। ত্রৈলোক্যনাথের ওই ছেলেটি ব্যাগ থেকে পর পর চারটি শিশি বের করল—একটা ম্যালেরিয়া জ্বরের আরক, একটা অজীর্ণ রোগের ওষুধ, একটা বহুমূত্র রোগের ব্রহ্মাস্ত্র, আর একটা মুখে মাখলে রং ফর্সা হয়। বাঙালি চিরকালের ক্রেডুলাস জাত। টাকে চুল বেরোবে না জেনেও কাঁড়ি টাকা ঢালবে ভাইটালাইজারে। কালো কখনো ফর্সা হবে না জেনেও মুখে মলম ঘষবে। টাকা ডবল হয় না জেনেও জোচ্চোরের পাল্লায় পড়বে।

তবু বাঙালির মধুরসত্তা, বাঙালি মনের মায়া, বাঙালি চেষ্টা করেও চাপা দিতে পারবে না। রাত বিরেতে বাঙালির বাড়িতে অতিথি এলে, গোটা পরিবার জেগে ওঠে আদর আপ্যায়ন করার জন্যে। যে কোনও সময়ে বাঙালির বাড়িতে গেলে, কিছু না কিছু খাওয়াবার চেষ্টা হবেই। বাঙালিয়ানার একটা মস্তবড় উপাদান হল এই আতিথেয়তা। বাঙালি অনেক সময় মানুষকে হতবাক করে দিতে পারে। সাংঘাতিক বিলিতি পোশাক, চোস্ত ইংরেজি, ঠোঁটে পাইপ, ঘ্যাম একজিকিউটিভ, চেনার উপায় নেই, বাঙালি না

অবাঙালি। এটা তাঁর বাইরের রূপ। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর একটা রূপান্তর হবে। অভাবনীয়। ধড়াচূড়া খুলে তিনি বসে পড়লেন হয়তো ঠাকুর ঘরে। সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। অথবা বৃদ্ধ মায়ের পাশটিতে গিয়ে বসলেন বাধ্য শিশুর মতো। বৃদ্ধা হয়তো খোকার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। একটু আদরও করতে পারেন। বাঙালিয়ানার একটা বড় দিক হল, মা-বাবার চোখে বাঙালির বয়স বাড়ে না। সে চির-খোকা। আমি এমন দৃশ্যও দেখেছি, পিতার বয়স নব্বই ছেলের বয়স ষাট। পিতা তিরস্কার করছেন, ঠিক যেমনটি করতেন সন্তানের শৈশবে। বাঙালি বাইরে যে-রকমই হোক বাড়িতে সে বাঙালি। আচারে, আচরণে, কথায়, আড্ডায়। সে জজ সায়েবই হোন, কি মেজর জেনারেল। একটি ধুতি আর গেঞ্জি হল পোশাক। পায়ে একটা চটি। এই ব্যাপারে বাঙালির আদর্শ— আশুতোষ, বিদ্যাসাগর। বাড়িতে জিনস পরা বাঙালিবাবু দেখতে পাওয়া কঠিন। বাঙালিয়ানার আর একটি দিক হল, জলের ব্যবহার। এমন জলপ্রীতি অন্য জাতির মধ্যে নেই। এঁটো-কাঁটার বাছ বিচার, আঁষ-নিরামিষ নিয়ে তুলকালাম একমাত্র বাঙালি পরিবারেই প্রবল। চেষ্টা করেও বাঙালি তার আদি বিশ্বাস ছাড়তে পারবে না; কারণ বিশ্বাস চলে গেছে সংস্কারে।' সেই কারণেই বাঙালির দুটি দিক— তার বাইরের দিক—যে দিকে আছে বারফট্টাই, নাস্তিকতা, আমেরিকানিজম, আচার-আচরণের বাড়াবাড়ি, অসভ্যতা, অবুঝের মতো কথা, অনুকরণপ্রিয়তা। সেখানে বাঙালি হল নাচুনে বাঙালি। আর একটা দিক হল ভেতরের দিক। শান্ত, সমাহিত, সুর ভাল লাগে, ভাল লাগে রং-রেখা-ছবি, ভাল লাগে কবিতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড়, সমুদ্র। সেখানে বাঙালি শুনতে পায় বিবেকের ঘুণ পোকা কাটছে, বাঙালির শান্ত জীবন কুটীর। স্ত্রীকে নিয়ে স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটে গিয়েও বাঙালি সন্তান রাত জাগে বিবেকের দংশনে—আমার পিতা! আমার মাতা! বাঙালিয়ানার অপর দিক হল—বাঙালি পারিবারিক জীব।

২

'বইপত্তর পড়ছ পড়ো, সেই সঙ্গে নিজের মনটাকেও পড়তে শেখো।' এক মহাপুরুষ একবার আমাকে বলেছিলেন। বর্ষাকাল। উশ্রী নদীর ধারে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আজ থেকে অন্তত তিরিশ বছর আগে তাঁরই আস্তানায়। এক পাশে বর্ষার স্ফীত উশ্রী সগর্জনে নামছে নিচে। অন্য তিন পাশে গভীর অরণ্যানী। সামান্য এক আট চালা হল সাধুর আস্তানা। মৌনী সাধু। সঙ্গে এক শিষ্য। একপাশে স্লেট-পেনসিল। মুখে প্রশ্ন, উত্তর লিখিত। দক্ষিণ ভারতীয় সন্ন্যাসী ইংরেজীতে মনে হয়েছিল খুবই ব্যুৎপন্ন। আমার প্রশ্ন ছিল অনেক। উত্তর এসেছিল একটি—'রিড ইওর মাইণ্ড।'

সেই নির্দেশ এতকাল ভুলেছিলাম খুবই স্বাভাবিক কারণে। আলো থেকে সরে এলেই অন্ধকার। ক্ষণ-সান্নিধ্যের আলোক স্পর্শে ভেতরটা তেমন উদ্ভাসিত হয়নি। তা ছাড়া জীবনের একটা নেশা মানুষকে বুঁদ করে রাখে। কিছু করার নেশায় করা। চলার নেশায় চলা। ঘোরে ঘুরে বেড়ান। দিন আসছে। দিন চলে যাচ্ছে। অজস্র কথার স্রোত বইছে উশ্রীর বর্ষার ঢলের মত। জীবনের ওপর দিয়ে যে সময় বয়ে গেল অতীতের দিকে, চলমান ক্যামেরায় সেই সময়কে যদি ধরে রাখা হত, আর এখন যদি পর্দায় ফেলে দেখান হত, তা হলে বোঝা যেত কি তামাশায় কেটে গেছে কাল! হাত নেড়েছি, মাথা নেড়েছি। চোখের ভঙ্গী করেছি। অন্তঃসারশূন্য বড় বড় কথা বলেছি। অকারণে নিজেকে জাহির করেছি। কখনও বিমর্ষ, হতাশ। কখনও উল্লসিত। কখনও ভাঁড়, কখনও চাটুকার। কখনও প্রভু, কখনও ক্রীতদাস! কখনও চরিত্রবান,

কখনও দুশ্চরিত্র। কখনও আদর্শবাদী, কখনও চরম আদর্শভ্রষ্ট। মন হীন, মননহীন একটা দেহের সংকল্প শূন্য অস্তিত্ব। সময় কি ভাবে, কি কাজে চলে গেল বোঝাই গেল না। 'অ্যাকশান রিপ্লে' দেখে একজন ব্যাটসম্যান যেমন বুঝতে পারেন, বলটা কি ভাবে খেলা উচিত ছিল। অতীত জীবনেব 'অ্যাকশান রিপ্লে' সম্ভব হলে, জীবনটাকে কি ভাবে খেলানো উচিত ছিল বোঝা যেত। চলে যাওয়া তিরিশটা বছরের প্রাপ্তি, হাত পা ছোঁড়ার ক্লান্তি আর স্বাভাবিক প্রাচীনতা। বাতি জ্বলতে জ্বলতে ক্ষইতে থাকে ঠিকই, কিন্তু আলো দিয়ে যায়। সে আলোয় বসে কেউ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে, কেউ নোট জাল করে। যে যাই করুক, বাতি গলতে গলতে আলো দেয়। জীবন তিরিশ কি চল্লিশ বছরের মত ক্ষয়েই গেল, কেউ কিছু পেল না।

'রিড ইওর মাইন্ড'। সেই মন পড়তে গিয়ে প্রতি মুহূর্তের উপলব্ধি, জীব-জগতে মানবজীবন হয়তো হীরের মতই দুর্লভ ; কিন্তু আকাটা হীরে, 'আনকাট ডায়মণ্ডে'র যেমন কোনও দাম নেই, অপরিশ্রুত, বিকাশহীন, মত্তপ্রায় জীবনেরও কোন দাম নেই। জীবন নামক শক্তি পোকার মত নড়াচড়া করিয়েছিল, ঘুরিয়েছিল, ফিরিয়েছিল, সবাই বলেছিল মানুষটা বেঁচে ছিল। একদিন সেই শক্তি উবে গেলেই মৃত্যু। একজন ছিল, একজন নেই, এর বেশি কিছু নয়। গণনার সংখ্যা হয়ে বেঁচে থাকার এই গ্লানি সময় সময় অসহ্য লাগলেও, ক্ষুদ্র স্বার্থের ছাতাটি খুলে মানুষ কেমন নিজের খেয়ালে টুকুর টুকুর করে জীবনের শেষ অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে চলে! জীবন নাটকে আমার ভূমিকাটা তাহলে কি ছিল! কার লেখা জানি না, একটি কবিতা খুঁজে পেয়েছি, যাতে আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আছে ঃ

পাঁচটা মিনিট সময় দাও
একটু সেজে আসি।
ভূমিকা! এখন ভূমিকাটা কি ?

একটু ধরিয়ে দেবে !
এই তো একটু আগেই
আমার ছিল ভাঁড়ের সাজ,
একটা বেলুনের মত ফুলো লোক
তার সঙ্গে বসে গিলছিলাম মদ
ওই মোড়ের পানশালায়
বলছিলাম মজার মজার কথা
পুরছিলাম আরও হাওয়া
ওই বেলুনটায়, কিসের আশায় !
জানো কী তা ? টাকা, টাকা
আমি হাসছি, খুব হাসছি
ওদিকে আমার স্ত্রী রোগশয্যায়
যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে
হয়তো চাইছে জল, একটু জল
কে দেবে ? আমি তো তখন ভাঁড়ের ভূমিকায়
পাঁচটা মিনিট সময় দাও একটু সেজে আসি
এবার কী ? এবার ভূমিকাটা কী ?
একটু আগে ছিল আমার বন্ধুর বেশ
একটি লোক, বেশ বড় লোক
তাকে নিয়ে বেড়িয়ে এলাম
কেন জানো ? সেই একই ব্যাপার, উমেদারি ।
আমি যখন ঘুরছি বেশ মজা করে ঘুরছি
ঠিক সেই সময় আমার স্ত্রী
একটু জলের আশায় হাঁ ক'রে, খাবি খেয়ে
জানি না, আমার কথা ভাবতে ভাবতে
অথবা না ভাবতে ভাবতে চলে গেল ।
আর আমি, ঠিক সেই সময় ফুরফুরে বাতাসে
লোকটির পাশে পাশে বেড়াতে বেড়াতে

আমাদের দাম্পত্য প্রেমের কথা বেশ ফেনিয়ে
বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে বলে চলেছি।
পাঁচটা মিনিট, বেশি না ঠিক পাঁচটা মিনিট
সময় আমাকে দাও
আমি সেজে নেবো নিখুঁত সাজ
কেবল বলে দাও ভূমিকাটা কী ?

যে সব দায়িত্ব, আদর্শ আর মূল্যবোধের অছি করে জীবন আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল, তার কোনও কিছুরই মর্যাদা আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হয়নি। সছিদ্র চালুনি থেকে সবই ঝরে পড়ে গেছে। এতকাল পরে নিজের মন পড়তে গিয়ে নিজেই আঁতকে উঠছি। মানুষের অবয়বে ঢুকে আছে জন্তুর মন। কখনও ঈর্ষায় কাতর, লোভে অশান্ত, ক্রোধে উন্মাদ, অহঙ্কারে অন্ধ, স্বার্থে সঙ্কুচিত। মহাপুরুষের ছবিতে মালা ঝুলিয়েছি বেহুঁশ অবস্থায়। হাজার বার পড়েছি, মহাজন যেনো গতঃ স পন্থাঃ। তাতে আমার ঘোড়ার ডিম হয়েছে। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়েও সেই একই প্রশ্ন, সীতা কার বাবা! পেঁয়াজের খোসার মত নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে দেখেছি, পরতে পরতে খুলে আসছে সংস্কারের খোসা, স্বার্থের খোসা, সঙ্কীর্ণতার গোলাপী আবরণ, কামনার ঝাঁঝালো গন্ধ, অন্তঃকরণের অংশ কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। জীবনের প্রাচীরে কুৎসিত এক বহুরূপী, ক্ষণে ক্ষণে রঙ পালটে চলেছে। প্রতিবেশীরা একেই বিশ্বাস করেছে, পিতা এর কথাই ভেবেছেন, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, একটি মেয়ে এসে এরই গলায় মালা পরিয়ে বলেছে, তুমিই আমার স্বামী, সন্তান এসে হাত ধরেছে পিতা বলে, বন্ধু এসে বলে গেছে গোপন কথা। দেশ ভেবেছে দেশাত্মবোধী, কর্ম ভেবেছে কর্মী, ধর্ম ভেবেছে ধার্মিক। আসলে আমি কিছুই না। শ্বাসে গ্রহণ করেছি পৃথিবীর বায়ু, প্রশ্বাসে ফেলেছি বিষ।

আমি জন্তু হয়ে জন্মেছি, মরতে চাই মানুষ হয়ে।'

৩

মনে একটা পাখি বসে আছে। একটা নয় দুটো পাখি। একটা অতি ছটফটে, সদা চঞ্চল। অন্যটি স্থির। মাঝে মধ্যে চঞ্চল পাখিটিকে বলে, অত ছটফটানি কিসের গো? একটু স্থির হয়ে দাঁড়ে বোসো। কৃষ্ণকথা বলো। সারা জীবন তো অনেক কপচালে। অনেক জ্ঞানের ঢ্যালা ছুঁড়লে অনেকের দিকে। নিজে কি পেলে? গুটিকয় লাল ধানি লঙ্কা! সাধুর নীমকাঠের কমণ্ডলু সাতধাম ঘুরে এল। স্বভাব কিন্তু পাল্টাল না। যে তেঁতো সেই তেঁতো।

সৎ শিক্ষার তো অভাব ছিল না। অজস্র সৎ গ্রন্থ। কিছু কিছু পড়াও হল। প্রতি যুগেই একাধিক মহাপুরুষ এলেন। সেই মহাপুরুষদের ঘিরে গড়ে উঠল সৎসঙ্গ। মঠ, মিশন, মন্দির, বিদ্যালয়, কলেজ, ধর্মশালা। হিন্দুধর্মটাই তো এক স্তবক আচরণবিধি। নিজেকে যত পরিশ্রুত করা যাবে ততই খাঁটি হিন্দু হওয়া যাবে। দেব-দেবী, কোষাকুষি, ধুনো, গঙ্গাজল ধর্ম নয়। মনের প্রস্তুতি। হিন্দু ধর্ম হল দেহের বাহিরে যে বিশাল সত্তা সেই সত্তায় নিজেকে বিসর্জন। সসীম থেকে অসীমে, ক্ষুদ্র থেকে বিশালে উত্তরণ। জৈব নীচতা থেকে দৈব উত্তুঙ্গতায় আরোহণ। হিন্দু ধর্ম হল মানবধর্ম।

সেই হিন্দু আমির কি অবস্থা! 'মন আমার।/পাগলা ঘোড়া রে কই থেকে কই লইয়া যায়॥/মন হইল ঘোড়া রে, বাতাস হইল জিন।/এমন যে গোয়াইরা বেটা রাত দিন দৌড়ায়॥' ধর্মটর্ম ছেড়ে মন মাছির মত কখনও বিষ্ঠায় কখনও রসগোল্লায়।

একটি লুঙ্গি আর কাঁধকাটা গেঞ্জি হল গৃহের ভূষণ। সকালে

এক কাপ চা মেরে, দিন শুরু। কি দিন, কেমন দিন! রাতে দিনের হিসেব নিতে বসে চক্ষুস্থির। সারাদিন কি করলে বাপু বেদান্তের ছারপোকা? আচ্ছা, সৎচিন্তা কি করেছ?

প্রথমেই কলে জল নেই দেখে, দোতলায় বাড়িঅলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে যমরাজকে স্মরণ। ফুলো চোখো, পেট মোটা, কুচুটে মানুষটাকে হে রাজাধিরাজ পত্রপাঠ গ্রাস করো। বুড়ো প্রতি মাসেই তাল ঠুকছে ভাড়া বাড়াও, ভাড়া বাড়াও, আর একটি সুবিধের মূলোচ্ছেদ করছে।

তারপর কি করলে?

তারপর বাড়ির বাইরে পা রেখেই চোখে পড়ল প্রতিবেশী দুর্গাবাবুর বড় ছেলে বিশাল এক ব্যাগ বাজার হাতে হেলেদুলে বাড়ি ফিরছে। প্রমাণ সাইজের একটি মাছের ন্যাজা অনুচ্চারিত অহঙ্কারের মত ব্যাগের পাশ দিয়ে বাতাসে সোচ্চার। ঠোঁটে একটি সিগারেট ঝুলছে। আমার দিকে আবার আড় চোখে তাকানো হল। মন অমনি তরফদার সেতারের মত বেজে উঠল, ওঃ খুব চলছে! কেন চলবে না বাছাধন, দু'নম্বরী পয়সা। বাড়িতে কালার টি ভি। মারুতি বুক করেছে। বাড়ির বাইরে চড়াপর্দার রঙ। জানলায় জানলায় বাহারী পর্দা। টবে টবে ফুলগাছ। অমন এক পুরুষে বড়লোক অনেক দেখেছি। যেদিন ইনকাম ট্যাক্স কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে, সেদিন বেলুন তোমার চুপসে যাবে মানিক।

ও মন তুই কৃষ্ণকথা বল। ঈর্ষা অতি বদ জিনিস। বাঙালী ব্যবসা করে দু'পয়সা করেছে, কেন তোমার চোখ টাটাচ্ছে! কেন টাটাবে না! দুশো গ্রাম মাছ, একটা কপি, গোটা ছয় কড়াইশুঁটি কিনতে যাকে দশবার পাঁয়তাড়া কষতে হয়, কেন তার ঈর্ষা হবে না! এর নাম সাম্যবাদ! আমার হাজার টাকা রোজগার হলে, ওর নশো টাকা হওয়া উচিত। আমার পাঁচশো হলে ওর চারশো। আমি

সুখে থাকবো, সবাই দুঃখে। আমি দূরে থেকে দেখব আর চুকচুক করব। জগতের এই তো নিয়ম হওয়া উচিত? হায়, উল্টো বুঝলি রাম!

তারপর কি করলে?

তারপর আমার প্রবাসী বড় ভাই আমাদের কমান মায়ের সেবার জন্যে তিন মাস কোনও টাকা পাঠায়নি বলে, দাড়ি কামাতে কামাতে তার পিণ্ডি চটকানো হল। বাবুর বড় মেয়ের অসুখ। মায়ের ওষুধ আর দুধের খরচের ভার সে নিয়েছিল। টাকাটায় ফ্যামিলির অনেক সাহায্য হত। ন'মাসে, ছ'মাসে এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি. সামান্য টোটকাটুটকি, লোহা ছ্যাঁকা দিয়ে এক আঁটি থানকুনির রস, কি গাঁদাল পাতার ঝোল, আর এক শিশি দুধে তিন শিশি জল, মন্দ চলছিল না, বাবুর মেয়ের অসুখ। লায়ার। যেসব ছেলে মায়ের সেবা করে না, তারা যত শিক্ষিতই হোক কুলাঙ্গার। এই বিয়ের মাসে টাকা ক'টা এলে তোফা হত। আমার মধ্যম শ্যালকের বিয়ে। মোটা টাকার ধাক্কা। শেষ পর্যন্ত বউয়ের পরামর্শই না শুনতে হয়। মাকে প্যাক করে জবলপুর দিয়ে এসো। সপ্তাহে তিন কেজি চাল, চোদ্দ কাপ চা আর দেড় কেজি গম বাঁচা মানে বেশ সেভিংস। মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন থেকেই টাকা না জমালে বাবাজীবন কি কাঁচকলায় মেয়ের গলায় মালা দেবে। পরামর্শটা মন্দ নয়, কিন্তু সংসারে কাজের লোক কমে যাবে। কুটনো কোটা, বাটনাবাটা, ছেলেমেয়ে ধরা, সস্ত্রীক ফুর্তি করতে গেলে রাত জেগে বাড়ি পাহারা দেওয়া। অ্যাতো কম খরচে কাজের লোক পাওয়া যায়! যা বাজার পড়েছে! কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনও নয়। কতকালের কথা। এখনও সমান সত্য। ওরে মনপাখি তুই কৃষ্ণকথা বল।

তারপর কি করলে?

তারপর আমাদের পুত্র, যাকে, সহস্রাধিক সদুপদেশের বন্যায় সবসময় প্লাবিত রাখা হয়, তার একটি থেকে স্খলিত হাওয়ায়, আমরা

স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে, দুদিক থেকে দুটো কান ধরে মনের আনন্দে টানাটানি। কি সেই অপরাধ? মায়ের আঁচল থেকে একটি আধুলি ঝেড়ে ডালমুট খেয়ে বেমালুম অস্বীকার। না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়াকে বলে চুরি। বুঝেছো বালক? বালক বলিল, মা আবার কবে পর হইল পিতঃ? তোমরাই তো বলিয়াছিলে মাতার চেয়ে আপনার পৃথিবীতে আর কেহ নাই। তাহার এমত ধড়িবাজ-উক্তি শুনিয়া আমরা উভয়ে অগ্নির মত, আগ্নেয়গিরির মত জ্বলিয়া, ফাটিয়া পড়িলাম। হারামজাদা, উল্লুক। দধিমন্থনের দণ্ডের মত ওই শাখামৃগটিকে আমরা উভয়ে ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া চরিত্রের নবনীত বাহিরের প্রয়াস চালাইলাম কিয়ৎক্ষণ। তৎপরে ক্লান্ত হইয়া এক পেয়ালা চা পান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম, হায়! সুকুমারমতি বালককে কি বুঝাইব, মাতা কি সত্যই আপনার! না দেশমাতা, না গর্ভধারিণী। আমার বৃদ্ধামাতা উপেক্ষিতা, অবহেলিতা, দাসীসদৃশা। আর দেশমাতা! আমাদেরই দ্বারা ধর্ষিতা? বালক, আমাদেরই শোণিত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত, তুমি মহাপুরুষ কেমন করিয়া হইবে। তুমি ছিঁচকে চোর হইলেই জন্ম সার্থক।

ওরে মন পাখি তুই কৃষ্ণকথা বল। পাখি যে কথা বলিতে চায় তাহা না শুনাই ভাল।

তারপর কি করলে?

ঘটা করে চান। বাথরুমে গুন্‌গুন্‌ গান। ঘাড়ে পাউডার লেপন। ভুঁড়ির তলায় কষি নামিয়ে, শব্দ করে করে চর্ব্যচুষ্য আহার। ঢেউ ঢেউ উদ্‌গার। তারপর একটা দোচোঙা, আর আধুনিক ফতুয়া (বুশশার্ট) পরে দেশোদ্ধারে গমন। সেখানে ভূমিকা!

কুর্মাকৃতি এই ধর্মভূমিতে আমরা রাজনৈতিক ক্রিমির মত কিলির বিলির করিতেছি। আমাদের মহাপুরুষ সকলের প্রতিকৃতি

প্রকোষ্ঠের দেয়ালে কোনওটি দক্ষিণ পার্শ্বে, কোনওটি বামপার্শ্বে হেলিয়া ত্রিভঙ্গ মুরারী। আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির, আমাদের কৃতজ্ঞতার ইহাই নমুনা। জনৈক অস্পষ্ট পুরুষ শুষ্ক মাল্যভূষিত, মাকড়সার তন্তুশোভিত। বোধকরি ওই পুরুষই আমার পিতৃদেব। মাতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইতে পারিলেই অপার শান্তি। পত্নিসোহাগে কতিপয় দিবস ধরাধামে কাটাইয়া অনুরূপভাবে আমাদেরও দেয়ালে বক্র-শ্যাম হইতে হইবে, সে সত্য ভুলিয়া গিয়াছি! আমাদের কর্মকান্ড দেখিয়া উত্তরপুরুষ অবশ্যই আরও শেয়ানা হইবে। মৃত্যুকালে মুখে এক বিন্দু গঙ্গোদক পাইব কি না সন্দেহ! বালক যদি প্রশ্ন করে, পিতঃ, কি করিয়া বেড়াইতেছ? মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া বলিতে হইবে, বৎস! আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি পুরাদমে উদোম হইয়া পালন করিতেছি। সূচ্যগ্র বংশ দণ্ড এ উহার গ্রাম্য অংশে, ও ইহার গ্রাম্য অংশে সাঁদ করাইতেছে। আমারটি খুলিয়া উহাতে উহারটি খুলিয়া তাহাতে। চক্রাকারে বংশ গোঁজন উৎসবে আমরা মাতিয়া উঠিয়াছি। সকলেই তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছি—শ্যালক, আমি যাহা করিতেছি তাহাই ঠিক। মহা-পুরুষগণ মুখ চুন করিয়া দেয়ালে বাঁকিয়া আছেন। বিদেশীগণ আসিয়া রাজঘাটে মাল্যদান করিতেছেন। কিছু নামাঙ্কিত জরদ্গব প্রতিমূর্তি দেশনামক ভাগাড়ের এখানে ওখানে বায়সবিষ্ঠা চর্চিত হইয়া আকাশের নীলিমায় ভরসা খুঁজিতেছেন। সেই প্রস্তর প্রতিমায় বৎসরান্তে সরকারী মালা ঝুলাইয়া আমরা নৃত্য করিতেছি —লাগ ভেল্কি লাগ, আজ আমাদের ঘাটকামানো কাল বৃষোৎসর্গ। বঙ্গ আমার জননী আমার খননেই স্বার্থ॥

ওরে ও মন পাখি তুই কৃষ্ণকথা বল।

ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। সেই ভাষা আমরা অতিশয় রপ্ত করিয়াছি। যিনিই আসনে তিনিই জ্বালামুখী। ভুরি ভুরি বাক্যস্রোতে, জ্ঞানপ্রবাহে দারিদ্র ভাসিয়া গিয়াছে, নিরাকার সাকার

হইয়াছে, অশিক্ষিত শিক্ষিত হইয়াছে, ভূমিহীন ভূমি পাইয়াছে, দেশ শস্যশ্যামলা হইয়াছে, পল্লী বিদেশভূমির ন্যায় উদ্যানশোভিত, তপোবনের ন্যায় প্রশান্ত, জাপানের ন্যায় মনোরম হইয়াছে। প্রাতে পৌরপিতাগণ স্মিত হাস্যে, স্বীয় কৃতকর্মের উপর দিয়া জয় রাম জয় রাম করিতে করিতে বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে বাহির হন। পল্লী-বাসীগণ তখন সেই দেশহিতব্রতীগণকে পাত্র পাত্র সরকারী সুপেয়, সুলভ দুগ্ধ সেবন করাইয়া মিলিত কণ্ঠে গাহিতে থাকেন—আহা যে ভালো করেছ মাইরি। আর ভালোতে কাজ নেই। এবার মানে মানে সরে পড়, আমরা বেঁচে যাই। অতঃপর গুপীযন্ত্র সহযোগে একতাবদ্ধ, সুউন্নত, মহাবুদ্ধিমান জাতি তারস্বরে নগর [ভাগাড়] সংকীর্তনে বাহির হয় ঃ

এ দেশেতে এই সুখ হোলো আবার কোথা যাই না জানি। / পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পাণি ॥ / কার বা আমি কে বা আমার / আসল বস্তু ঠিক নাহি তার। / বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার। / উদয় হয় না দিনমণি ॥

অতঃপর কি হইবে ?

অশ্বডিম্ব হইবে। সভা সমিতি হইবে। ঝাণ্ডার আস্ফালন হইবে। নিদ্রিত রাজকুলের চোখের সামনে দেশ শ্মশান হইবে। একটিও বাঁশ-ঝাড় অবশিষ্ট থাকিবে না। অশ্বডিম্ব ঘোটক প্রসব করিবে। সেই ঘোটকে স্বদেশী শক, হূণ, পাঠান দল, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে মুক্ত অসিহস্তে খ্যাচাখাঁই করিবে। আর উত্তরপুরুষ বীর দেহে খড় পুরিয়া যাদুঘর বানাইবে। তাহার পর খড়ায়িত বীরগণের পদপ্রান্তে বসিয়া অক্ষক্রীড়া করিবে, দারু সেবন করিবে, গুরু গুরু শব্দে যতপ্রকার কেলোর কীর্তি আছে তাহা করিবে। অবশেষে গাহিতে থাকিবে—আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া / কাল আমাদের দোল। / পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে। / বোল হরি বোল ॥

সরতে সরতে আমরা সবাই খোপে এসে ঢুকেছি। আমাদের এই মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনচর্যা, চিন্তাভাবনা, সবই আমাদের ঝ্যাঁটা-পেটা-আরশোলার মত কানকোভাঙা, দাড়া ভাঙা একধরনের প্রাণীতে পরিণত করেছে। চামচে মাপা ধূর্তের জীবন। মেপে মেপে পা ফেলা। কতরকমের শৃঙ্খল? আমাদের বংশ-পরিচয়, স্ট্যাটাস, মান-সম্মান, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু। মাকড়সার জালে জড়ানো বাহারী কাচপোকা, সময়ের শংকা কালো মাকড়সার মত আলপিনের চোখে তাকিয়ে আছে, ধীরে ধীরে সরে আসছে রোমশ দাড়া নেড়ে। এই বুঝি আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হল। বাঁধা মাইনের চাকরিটা ষাট বছর পর্যন্ত থাকবে তো? সেই সময়ের মধ্যে ছেলে জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হবে তো? মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে হবে তো? ব্যাঙ্কে বার্ধক্যের সঞ্চয় মাস চালানোর মত সুদ আনবে তো? রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়বে না তো? বাতে পঙ্গু হব না তো? জীবকোষের কোথাও হঠাৎ কর্কট রোগ বাসা করবে না তো? শেষ অবদি বোলচাল, ঠাট-বাট ঠিক থাকবে তো? লোকে সেলাম বাজাবে তো? মৃত্যুটা না ভুগে হবে তো? স্ত্রীর আগে যেতে পারবো তো? ছেলে মুখাগ্নি করবে তো? অশৌচান্তে মস্তক মুণ্ডন করবে তো? শ্রাদ্ধে যথেষ্ট ঘটা হবে তো? দেয়ালে বড় মাপের ছবি ঝুলবে তো! কেউ দুফোঁটা চোখের জল ফেলবে তো! হরেকরকমের তো? জীবন যেন সার্কাস-কন্যার তারে হাঁটা। সব সময় আতঙ্ক, এই বুঝি ভারসাম্য হারিয়ে চিৎপাত হয়ে কয়েক শো ফুট নিচে পড়ে গেলুম। পতন রোধের জন্যে নিচে কোনও জাল বিছানো নেই।

পরিসর যত ছোটই হোক, চারটে দেয়াল চাই। মাথার ওপর ছাদ থাকা চাই দোতলার ঘর হলে ভালো হয়। তার ওপর যেন আরও কয়েকটি তলা থাকে। তাহলে গ্রীষ্মের উত্তাপে তেমন কষ্ট হবে না। দক্ষিণটি যেন খোলা থাকে। সেদিকে একটি মাঠ বা জলাশয় থাকে। দু একটি বৃক্ষ। বৃক্ষের ডালপালা যেন জানালায় এসে খোঁচা না মারে। ঝড়ের দুলুনির জন্যে যেন মাপা জায়গা থাকে। ডালের ঝাপটায় মাথার ওপর বৈদ্যুতিক তার যেন ছিঁড়ে না যায়। ভোরে দু একটি গান-জানা-পাখি যেন উড়ে এসে গান শুনিয়ে যায়। চব্বিশ ঘণ্টা কলে যেন অফুরন্ত জল থাকে। মাথার ওপরের প্রতিবেশী যেন শান্তশিষ্ট, ভদ্র হয়। নিঃশব্দে চলা ফেরা। আমি সরব হলেও তারা যেন নীরব হয়। বেশি কাচ্চাবাচ্চা যেন না থাকে। তাদের বাড়ির মেয়েরা যেন সুন্দরী হয়। হিসেবী জীবনের সমস্যা অনেক। শরীরের বাইরে যত চেকনাই, ভেতরটা নড়বড়ে। বেশির ভাগই পিপু-ফিশুর দল! মুখে বচনের স্টেনগান।

সকালে ভালো কাপে খুসবুঅলা চা চাই। আবার মাসকাবারী চায়ের খরচ নিয়ে চেল্লানোও চাই। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মাখম খাওয়া একটি দর্শনীয় ক্রিয়াকাণ্ড। একশো গ্রামে সারা পরিবার এক সপ্তাহ। কেন্দ্র বা রাজ্য কি বাজেট করে! মধ্যবিত্তের বাজেট এক অসাধারণ অর্থনৈতিক ব্যায়াম। সানমাইকা লাগানো একটি খানা টেবিল না হলে জাতে ওঠা যায় না। আহার শেষে কার ঘাড়ে মোছার ভার পড়বে, এই ভয়ে খবরের কাগজ পেতে খাওয়া। মাখমের পাত্রটি অবশ্যই সুদৃশ্য। ছুরিটিও বেশ চিকন। রুটিতে মাখম মাখাবার সময় পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়। সকলেই সকলের নজরবন্দী। ছুরির ডগা দিয়ে বেশি মাখম কেটে নিলে নাকি? কত্তার বাজেট শেষ মাসে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে। স্নেহবস্তুর মৃদু স্পর্শে মানস আহার। রোজ মাছ না হলে মাথায় বজ্রাঘাত। সে

মাছের চেহারা কেমন! মাইক্রস্কোপ দিয়ে খুঁজে নিতে হয়। পাতের পাশে কাঁটা পড়ে থাকে, বেড়াল মুচকি হেসে সরে যায়। বাবু এমন চোষন করেছেন, কাঁটার খাঁজে সামান্য একটু ফাইবারও লেগে নেই। ট্যাবলেট আকৃতি দুটি সন্দেশ, শৌখীন প্লেট ঝকঝকে চামচ বাহারী গ্লাসে জল, অতিথি সেবার আধুনিক ব্যবস্থা। এর বেশি, ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গতি নেই। ইয়ার দোস্তকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করার ইচ্ছে হলে এক সপ্তাহ আগে গৃহিণীর কাছে লিখিত আবেদন পেশ করতে হবে। মঞ্জুর হলে তবেই আবাহন জানানো যাবে। সে অবস্থা আর নেই। পকেটে পকেটে ক্যাল-কুলেটার, ঘরে ঘরে ক্যালকুলেটার। অসময়ে এক কাপ চায়ের প্রয়োজন হলে ডাকাবুকো কর্তাকে ততোধিক ডাকাবুকো গৃহিণীর সামনে গিয়ে মোসায়েবের মত হেঁ-হেঁ করতে হবে। অফিসে যাঁর আস্ফালনে কেরানীকুল তটস্থ, গৃহে তাঁর অন্য চেহারা। হ্যাঁগা, হাঁগা করে দিনাতিপাত। আলোচনার বিষয়বস্তু বৃত্তাকার, ওয়াইফ কিম্বা মিসেসের হয় হাইপ্রেসার, না হয় অ্যানিমিয়া, না হয় মাইগ্রেন, না হয় ফ্ল্যাটুলেনস, না হয় অম্বল, না হয় বাত। ছেলের এডুকেশান। আর শ্বশুরবাড়ির কৃতী কারুর সাফল্যের বৃত্তান্ত। কোনও একজন শ্যালক, অথবা শ্যালিকাকে অ্যামেরিকায় থাকতেই হবে। যেমন আমাদের বরাত! তা না হলে শুনতে হবে কেন, কি দেশ! কি মাইনে? দেখতে হবে কেন, হোমিওপ্যাথিক শিশিতে যাবার সময় দিয়ে গেছে বিলিতি পারফ্যুম। জামা সাতবার ধোবার পরও গন্ধ লেগে আছে।

একটি খাট চাই। তার ওপর হয় এলাহী একটি ছোবড়ার গদি, সামর্থ্যে কুলোলে আধুনিক ফোম ম্যাট্রেস। লতাপাতা কাটা বেডকভার চাই। সেটি অবশ্যই একসপোর্ট কোয়ালিটির। দাম পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি হলে হৃদয় চলকে উঠবে। দামী একটি বেডকভার তোলা থাকবে। মেয়েকে দেখতে এলে, অথবা কর্তার

অফিসের বন্ধুরা এলে পাতা হবে। অভ্যাগতদের কেউ তার ওপর অ্যাশট্রে, কি খাবারের প্লেট রাখলে, গৃহিণী অন্তরালে কর্তাকে ফিসফিস করে বলবেন, দিলে বারোটা বাজিয়ে।

বারো মাস পাখার বাতাস চাই। রাতে লোডশেডিং হলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবাই মুখপোড়া। ইলেকট্রিক বিলের অঙ্ক সামান্য বাড়লেই চিৎকার, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভাইপোতে ঝটাপটি। বাথরুমের আলো জ্বাললে কেউ নেবায় না। লক্ষ্মী-ছাড়ার দল।

বাজার খরচের চেয়ে প্রসাধনের খরচ বেশি। আধকৌটো পাউডার মেখে মহাদেব হয়ে তার ওপর গেঞ্জি আর জামা। মেয়েরা মুখে সাবান ঘষছে তো ঘষছেই। সাবানদানীতে জল থই থই। পঞ্চাশ ভাগ গলেই চলে গেল, টুথপেস্ট টিউবের আকৃতি ক্রমশই বোম্বাই হচ্ছে। ফ্যামিলি সাইজ। দু'হাতে তুলতে হয়। টিপলে ফুট-খানেক বেরোবে। দাঁতে লাগবে আধ ইঞ্চি, বাকিটা বাতিল। পেনি-ওয়াইজ পাউণ্ড-ফুলিশের দল।

অভ্যাসের দাস, অর্থনীতির দাস, বাক্‌সর্বস্ব, অকর্মণ্য এই প্রাণীটিকে হঠাৎ যদি কেউ বলে—যাও বৎস, তোমার সাদা-কলারের চাকরিটি কেড়ে নেওয়া হল, তোমার ভুয়ো নিরাপত্তার বোধ আর রইল না, কথা বেচে, দালালী করে আর চলবে না। ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে মানুষের সারি, বেতনভোগী বুদ্ধিজীবী, যাঁর বাকচাতুর্যে সবাই অস্থির, জ্ঞানের যিনি হ্যালোজেন বাতি, তিনি সহকর্মীর সঙ্গে কাজ ভুলে খেলার আলোচনায় মশগুল। রেলের টিকিট-ঘুলঘুলিতে হাত ঢুকিয়ে একটি টিকিটের জন্যে আকুলিবিকুলি, ট্রেন ছেড়ে যায়, নিজের অধিকারবোধ ষোল আনা সচেতন কর্মবীর, শুনেও শুনছেন না। এইসব প্রোটিন সচেতন, অর্থ সচেতন, পরিবার সচেতন, স্বার্থ সচেতন, ফ্ল্যাটবাসী, পণ আদায়কারী, কালীমন্দির গমনকারী, হিন্দী ছবিসেবী, পেপার-

ব্যাঙ্ক প্রেমী কর্মবীরদের যদি বলা হয়, যাও বৎস, ফুটপাথে, নীল আকাশের নিচে নিরালম্ব অবস্থান করো নিজের মুরোদটি একবার যাচাই করো।

তাহলে কি হবে! অনেকেই চোখে ধুতরো ফুল দেখবেন।

অথচ এই স্বাধীন ভারতের বৃহদাংশ পড়ে আছে পথের পাশে। মাঠে ঘাটে ঝুপড়িতে। সব আয়োজনই তো, অর্থশালীদের জন্যে। ভদ্রগোছের একটি আস্তানা—ভাড়া সাতশো। সেলামী পাঁচ হাজার। ভদ্রলোকের দৈনিক জীবনযাত্রার খরচ শতের অধিক। সংখ্যা গরিষ্ঠের মাসিক আয় একশো হলেও খুব হল। এঁদের জন্যেই যত জ্ঞানের কথা, ত্যাগের কথা, পরিকল্পনার যত তামাশা।

তবু এঁরা সুখী। ভাঙা আয়না, ফেলে দেওয়া চিরুনি, বাবুর বাড়ির উচ্ছিষ্ট, রোদে শুকনো রুটি, ফেলে দেওয়া টিনের কৌটো, ছেঁড়া চট, ভাঙা লণ্ঠন, সিনেমার পোস্টার, এইসব সামান্য সামান্য বৈভব নিয়ে জীবনকে যাঁরা নির্ভয়ে চ্যালেঞ্জ করেন, তাঁরাই এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিক। তাঁদের মাথার ওপর হোর্ডিং-এ সিনেমার রাগী নায়কের বিদ্রোহ, নায়িকার প্রেম, সেরা মিলের সেরা কাপড়ে যুবক-যুবতী, চুলের শ্যাম্পু, মুখে মেক আপ, প্রেসার কুকার, নিরামিষ প্রোটিন, ষাট লক্ষ টাকার লটারি। এঁদের লজ্জা দিতে গিয়ে সারা দেশ আজ লজ্জায় সঙ্কুচিত। জীবনের শেষ কথা, মাথার ওপর আকাশ, পায়ের নিচে মাটি। যেতে একদিন সকলকেই হবে সাজানো ঘরের সুন্দর খাট থেকেই হোক আর ফুটপাত থেকেই হোক। তবে মানবতার আকাশ-প্রদীপটি যেন নিবে না যায়।

৫

আমার এক পাগলা বন্ধু ছিল। বদ্ধ পাগল নয়। কোনও কোনও ব্যাপারে সাধারণের চেয়ে অসাধারণ। ভূত প্রেতে বিশ্বাসী অথচ ভীতু নয়। দিনে অলস। রাতে ভীষণ কর্মক্ষম। যত রাত বাড়ে ততই তার কাজের ঘটা বাড়ে। বেশির ভাগ রাত সে জেগেই কাটাত। তখন সে এক আনন্দময় মহাপুরুষ। মুখ চোখের চেহারাই পাল্টে যেত। আমাদের যেমন দিন শেষ হলেই মন খারাপ হয়ে যায়, বিশেষত শীতকালে, তার তেমনি রাত শেষ হলেই মন খারাপ হয়ে যেত। বিমর্ষ হয়ে পড়ত। বলত, আবার সেই ক্যাটকেটে রোদ উঠবে। খা খা করে কাক ডাকবে। সারা পৃথিবী জেগে উঠে ক্যাচোরম্যাচোর শুরু করবে। এমন রাত বিলাসী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। শুনেছি কারুর কারুর স্বভাব-চক্র এই রকম বেসুরে বাঁধা থাকে। কেউ দিবসের প্রাণী, কেউ রাতজাগা প্রাণী, অনেকটা প্যাঁচা অথবা বাদুড়ের মত। মহাপুরুষরা বলছেন, ঘুম একটা অভ্যাস। নিদ্রাকেও জয় করা যায়। নেপোলিয়ান রণস্থলে ঘোড়ার পিঠেই অল্প একটু ঘুমিয়ে নিতেন। রোমেলও তাই। মহাত্মা গান্ধী ঘণ্টা কয়েক মাত্র বিশ্রাম নিতেন।

আমার সেই পাগলা বন্ধু হিসেব করে দেখিয়েছিল, চব্বিশ ঘণ্টার আটঘণ্টা কর্মস্থলে, তিনঘণ্টা পথে, দুঘণ্টা স্নান, আহার কাপড়জামা ধোলাই, হ্যানা ত্যানা, আট ঘণ্টা ঘুম। একুশ ঘণ্টা এই ভাবে গেল, হাতে রইল আর মাত্র তিন ঘণ্টা। সেই দুর্লভ তিনটি ঘণ্টাও খেয়ে নেবে পরিবার পরিজন, প্রাতবেশী! তাহলে তোমার নিজের জন্যে রইলটা কি? দিন গেল বৃথা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রায়। ঘুমিয়েই জীবনের অর্ধেক পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেল।

কখনও কখনও পূর্ণিমা রাতে সে আমার কাছে ছুটে আসত, 'কি রে আজ রাতেও তুই ঘুমোবি না কি?' হাই তুলতে তুলতে বলতুম, বেশ ঘুম পাচ্ছে, এবার শুলেই হয়।' 'তুই এমন চাঁদিনী রাতেও ঘুমোবি? তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই রে? পূর্ণিমা রাতে কেউ ঘুমোয়! অমাবস্যার রাত হলে কিছু বলার ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ বেঁচে থাকলে এমন রাতে কি করতেন বলত? যমুনার তীরে গিয়ে কদমগাছের তলায় বসে বাঁশিতে ফুঁ দিতেন।'

'কাল অফিস আছে ভাই। আমি তো আর কৃষ্ণ নই। আমার জন্যে কোনও যশোদা শিকেতে ননী ঝুলিয়ে রাখবেন না। খেটে রোজগার করতে হবে।'

'সে তো আমাকেও হবে।'

তারপর তার করুণ মিনতি, 'আজ আর ঘুমোসনি। জানিস জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এক বৃদ্ধ খাজাঞ্চি ছিলেন। দোতলার বারান্দায় চাঁদের আলো লুটিয়ে আছে জাফরির জালিকাটা ছায়া নিয়ে। আস্তে আস্তে চোরের মত ঘরের দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে এলেন। মাঝ রাত। নিস্তব্ধ পৃথিবী। চারপাশে চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। স্থূল শরীর। মেঝেতে কাছা কোঁচা লুটোচ্ছে। সর্ব অঙ্গে চাঁদের আলো মেখে তিনি ধাপুস ধুপুস নাচছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে একদিন ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। "আপনি নাচছেন কেন?" "কি করব বাবা, আমার যে বড় নাচ পাচ্ছে।" সেই প্রৌঢ় চন্দ্ররসিক খাজাঞ্চির মত আমারও নাচ পায়। মানুষ চাঁদের দেশ থেকে ঘুরে এল আর আমরা একটা রাত জেগে কাটাতে পারব না!'

রাত না জাগলে রাতের রহস্য বোঝা যায় না। গভীর রাতে পৃথিবীর আর এক রূপ। দিনে আমরা কথা বলি, কাজ করি। রাতে পৃথিবী কথা বলে। নিজের ইতিহাস লিখতে বসে। অনেক

বয়েস হল। কোটী-কোটী সন্তানের জননী। কোল কখনও খালি হয় না। যে আকাশে শান্তির শ্বেত পায়রা উড়ছে, সেই আকাশেই বিষাক্ত ছাতা মেলেছে পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজষ্ক্রিয় বস্তু-কণা। সবাই পৃথিবীর সন্তান, কেউ দানব, কেউ দেবতা।

সেদিনও ছিল পূর্ণিমার রাত। আমি আর আমার বন্ধু, দু'জনে বসে আছি গঙ্গার ধারের পোড়ো ঘাটে। পাশেই একটি শিব-মন্দির। সামনে বয়ে চলেছে বৈশাখের গঙ্গা। পরপারে মন্দিরের চূড়ো আকাশ ছুঁয়ে আছে। কেউ কোথাও নেই। চারপাশ নির্জন। মাঝে মাঝে বাতাসে চাঁদের আলো ঝলসানো গাছের পাতা থির থির করে কাঁপছে। দু'জনে বসে বসে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছি। আজ গেলে কাল কি হবে, কাল গেলে পরশু কি হবে? দুজনেই তখন বেকার। পাল তোলা একটা নৌকো দক্ষিণ থেকে উত্তরে ভেসে গেল রাজহাঁসের মত। ওপারের কোথাও পেটা ঘড়িতে দশটা বাজল। ভাবছি এবার উঠতে হবে। এমন সময় পেছনের গাছের ডালে বসে চ্যাঁ, চ্যাঁ করে একটা প্যাঁচা তিনবার ডেকে উঠল। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক কাণ্ড হল। আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটা যেন কুয়াশার আঁচল নেমে এল। এপার ওপার সব একাকার। শরীর পাথরের মত ভারি। নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। পলতে ফুরনো বাতির মত চেতনার দীপ নিবে গেল। আর জানি না। কি যে কি হয়ে গেল। আমাদের চেতনা যখন ফিরে এল, তখন দেখি আমাদের কোমর পর্যন্ত জলের তলায়। জোয়ার এসে গেছে বহুক্ষণ। নদী শখানেক হাত ওপরে উঠে এসেছে। একেবারে টইটম্বুর। ঢেউয়ের তালে তালে আমাদের শরীর ডাইনে বামে দুলছে। আচ্ছন্ন ভাব কাটতে আর একটু দেরি হলেই আমরা ভেসে চলে যেতুম। ওপারের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। নিটোল গোল একটি চাঁদ পশ্চিমে ঢল নিয়েছে। জল যেন তরল কাঁচ। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জোয়ারের স্রোত ছুটছে।

ঘাটের পইঠেতে ঢেউ এসে উথলে পড়েছে। অদ্ভুত তার শব্দ। নদী যেন রাতের সঙ্গে কথা বলছে। দূর থেকে বাতাসে স্পষ্ট ভেসে এল, বলো হরি, হরি বোল।

আমরা দু'জনে কোনও মতে উঠে দাঁড়ালুম। পায়ে চটি জোড়া আর পায়ে নেই। শরীর তখনও বেশ ভারি। জামা-কাপড় ভিজে সপসপে। চেতনা তখনও আচ্ছন্ন। পরস্পরের মুখে একই প্রশ্ন—কি হোলো বল তো? কি হয়েছিল বল তো?

আজও সে প্রশ্নের জবাব মেলে নি। রাতের সব রহস্যের জবাব দিনের ভাণ্ডারে নেই। দিনে দৃষ্টি যদি এক মাইল দৌড়ায়, রাতে মাত্র হাত খানেক। যেখানে কোনও রহস্যই নেই সেখানেও রহস্য থই থই করে।

গভীর রাতে একটি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের অভিজ্ঞতা আজও মন থেকে মুছে যায় নি। সাবেক কালের পুরোনো একটা বাড়ির ছাদে আমরা দু'জনে বসে আছি। মাথার ওপর রাতের আকাশ থম থম করছে। চাঁদির টুকরোর মত এক গাদা তারা। কোনওটা স্থির, কোনওটা দপ্ দপ্ করছে। নিচে দোতলার একটি ঘরে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। ওই বাড়ির বড় মেয়ে রাখি তিন মাস হল অসুস্থ। সেদিন ছিল খুব বাড়াবাড়ির দিন। একটু আগেই দেখে এসেছি মাথার কাছে অভিজ্ঞ দু'জন ডাক্তার বসে আছেন। অক্সিজেন চলছে। ঘরে, বাইরের বারান্দায়, থামের অন্ধকার আড়ালে আত্মীয় স্বজনেরা কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। ফিস্ ফিস্ কথা। একটু আধটু চুড়ির শব্দ, মাঝে সাঝে। ঘরে কখনও হট ওয়াটার ব্যাগ যাচ্ছে। কখনও বেরিয়ে আসছে জলের পাত্র। তাতে ভাসছে ইন্জেকসানের খালি অ্যাম্পুলস। এই সব দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে আমরা দু'জনে ছাদে চলে এসেছি। সকলেই যেন অপেক্ষা করছেন। মহামান্য একজন কেউ আসবেন! অত্যন্ত প্রতাপশালী, নিষ্ঠুর অথচ মাননীয়। যাঁর আগমনকে সহজে কেউ ঠেকাতে পারে না। যাঁর কাছে কৃপাভিক্ষা অর্থহীন।

রাখী খুব গুণী মেয়ে ছিল। সুন্দরী। একই গুরুর কাছে আমরা গান শিখতুম। মাস ছয়েক আগে মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে খুব নাম করেছিল। মঞ্চে ওঠার আগে আমার কাছে তার লেডিজ কোট, আর হাত ব্যাগ রেখে গিয়েছিল। দুর্লভ সম্পদের মত বুকে ধরে বসেছিলুম। আমার সে বয়েসটা একটু গোলমেলে ছিল। সামান্য বাতাস, কি একটু সৌরভ, কি এক চিলতে চাঁদের আলো, কি একটু মিষ্টি হাসিতে মনের দরজা খুলে যেত। একটা পথ এগিয়ে যেত দূর থেকে দূরে। নদী, পর্বত, জল, উপত্যকা পেরিয়ে সোনালী কোনও এক দিগন্তে।

অন্ধকার নির্জন ছাদে আলসের ওপর বসে আছি। রাত হেঁটে চলেছে জরার দিকে। ছাদটা রাখীর খুব প্রিয় ছিল। আলসেতে হেলান দিয়ে দুপুরে চুল শুকতো। গ্রীষ্মের রাতে মাদুর বিছিয়ে গুনগুন করে গান শোনাত। টবে টবে বেল আর রজনীগন্ধা গন্ধ ছড়াত। মাঝে মাঝে হেসে উঠত জলতরঙ্গের সুরে।

সেই সব মুহূর্তের কথা ভাবছি। মন বড় বিষণ্ন। এই রাত তারা নিয়ে ঘুরে ঘুরে আসবে। চাঁদ চিরকাল এসে উঠবে শুক্ল-পক্ষের আকাশে। সবই থাকবে। থাকব না আমি, থাকবে না রাখী। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে। মন ঘোলাটে হয়ে উঠছে চিন্তায়। অন্যের পরমায়ু হরণ করে আর একজনকে বাঁচাবার কায়দা তান্ত্রিকরা শুনেছি জানতেন। ছেলেবেলায় সিঁটিয়ে থাকতুম যেই শুনতুম আজ রাতে নিশি ডাকবে। মুখ কাটা একটি ডাব হাতে মাঝ রাতে পাড়ায় পাড়ায় হেঁকে যাবে অমুক আছ অমুক। যে উত্তর দেবে, কে ? অমনি ডাবের মুখটি চাপা দিয়ে দেবে। একজনের প্রাণ চলে এল ডাবের জলে। সেই জল খেয়ে বেঁচে উঠবে আর একজন। আমি রাখীর জন্যে সে বয়েসে প্রাণ দিতে পারতুম।

ছাদে বিশাল একটা টব ছিল। টবে মনসা গাছ। দেড় মানুষ সমান ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সেই দিকে চোখ পড়তেই চমকে-

উঠলুম। সাদা মত কে একজন দাঁড়িয়ে। ভাল করে তাকাতেই দেখি রাখী দাঁড়িয়ে আছে, সাদা সিল্কের শাড়ি। এলো চুল। একেবারে সুস্থ, উজ্জ্বল চেহারা। রোগের কোনও চিহ্ন নেই। আনন্দে বুক ছলকে উঠল। রাখী তুমি ভাল হয়ে গেছ? পর মুহূর্তেই নিচে কান্নার রোল উঠল। মনসা গাছের দিকে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। রাখী চলে গেল। সেই যে গেল আর এল না। অথচ আমি এখনও বেঁচে আছি।

আমাকে যে রাত জাগতে শিখিয়েছিল সেও আর নেই। সঙ্গী-হীন আমি জেগে থাকি। কখনও শুনি পাখির ছানা করুণ সুরে ডাকছে। কোথাও একটা গরু একবার মাত্র ডেকেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শিশু কাঁদছে কঁকিয়ে কঁকিয়ে। মা ঘুম জড়ানো সুরে ভোলবার চেষ্টা করছে।

আকাশের একেবারে উত্তর সীমায় এই গভীর রাতে হিমালয় জেগে আছে। শিখরের পর শিখরের তরঙ্গ। ক্ষুদ্র মানুষ যখন চার দেয়ালের নিরাপদ আশ্রয়ে, সাত বাই চার খাটে, তখন বিশাল শব্দ, হিমবাহ নেমে আসছে। গোমুখী থেকে গঙ্গা নেমে আসছে সধূম স্রোতে। বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে। কোথাও একটি পাহাড়ী নদী নুড়ি পাথরের সঙ্গে প্রাণের কথা কইতে কইতে, ছোট চরণেব কবিতা লিখতে লিখতে এগিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশে। গহন অরণ্যে একটি মৌচাকে মধু তৈরি হচ্ছে। এখানে আমি যখন জেগে তখন অন্য কোনও এক শহরে অনিকেত এক বৃদ্ধ ভীষণ শীতে হেঁটে চলেছে। জানে না কোথায় যেতে হবে। পৃথিবী নিদ্রাতুর, পাথরের দেয়াল ঘেরা জলাশয়ে চাঁদ নেমেছে অবগাহনে। দেহাতী মা সেই চন্দ্রমুখ দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গত শীতে কোল খালি করে তার শিশুটি চলে গেছে। এ যেন তারই মুখ। রাত আছে তাই ফুল ফোটা আছে। ধানে দুধ জমে রাতে। রাত আছে তাই যোগীরা আছেন। ভোগী যখন বেহুঁস। যোগী তখন মহাকালের সঙ্গে হাত মেলান।

৬

যদি সন্দেহ হয় ঈশ্বর আছেন কি না, তাহলে কি খুব অন্যায় হবে? পৃথিবী জুড়ে মানুষ যে ভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! জীবনের খোল-নলচে সব খুলে যাবার জোগাড়। দেবতারা সব পাথরের মূর্তি হয়ে মন্দিরে মন্দিরে বসে আছেন। সকালসন্ধ্যে মহাসমারোহে পুজো আরতি। সেবার ঘটা। বিশ্বাসী মানুষের প্রত্যাশা নিয়ে অহরহ মাথাকোটা। কার কোন প্রত্যাশা পূর্ণ হচ্ছে। যিনি চাকরি চেয়েছিলেন তাঁর কি চাকরি জুটেছে? যিনি সন্তানের আরোগ্য কামনা করেছিলেন তাঁর সন্তান কি সুস্থ শরীরে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে? যিনি সকালসন্ধ্যা দেব-আরাধনা না করে জলগ্রহণ করেন না, তাঁর স্বামীটি কেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন? সাজানো সংসার কেন তছনছ হয়ে গেল? কারণটা কি?

বিশ্বাসী মানুষের সেই এক কথা, সেই এক বিশ্বাস—যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ। সব কেড়েকুড়ে নিয়ে পথে বসিয়ে ছেড়ে দেন। সুখ মানুষকে ভোঁতা করে দেয়, স্থূল করে দেয়, অনুভূতিশূন্য দানব বানিয়ে ছেড়ে দেয়। সুখীমানুষ, ভোগী-মানুষ না ঈশ্বরবাদী না নিরীশ্বরবাদী। তিনি বোঝেন, বাড়ি, গাড়ি, রোজগার, হাইপ্রেসার, লোপ্রেসার, সুগার, হার্ট। পাড়ায় থাকেন একঘরে হয়ে। আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন। বলা যায় না যদি কেউ কিছু চেয়ে বসে! কেড়ে না নিলে হাত দিয়ে জল গলে না। ভিখিরি যখন ট্র্যাফিক সিগনালে আটকে থাকা ধনী মানুষের ঝকঝকে গাড়ির সামনে হাত পাতে, তখন দাঁত খিঁচুনি ছাড়া প্রায়শই কিছু পায় না। তবে মাস্তান যখন পাঁচশো টাকার চাঁদার বিল বাড়িয়ে ধরে, তখন কান্না-হাসি মুখে ড্রয়ারে হাত চলে যায়।

অনেকের ঘরের দেয়ালে গুরুদেবের ছবি ঝোলে, মাল্যভূষিত, গুরুর নির্দেশ কেউ কিন্তু পালন করেন না।

ঈশ্বর সেই কারণেই না কি সুখ কেড়ে নেন। পাশ থেকে প্রিয়জনকে সরিয়ে নেন। যত রকমের দুর্বিপাক আছে সব ঢেলে দেন ঘাড়ের ওপর। মানুষ তখন আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে, হা ভগবান! দুর্ভোগের বেদীতে তাঁর অধিষ্ঠান। হাবুডুবু না খেলে তিনি ঝুঁটি ধরে তোলেন না। পৃথিবীর তাবৎ দুর্ভাগা তাঁর কৃপাধন্য।

তবু সংশয় আসে। ঈশ্বর কি আছেন? না নিৎসের কথাই সত্যি, গড ইজ ডেড। ঈশ্বর ঠিকই আছেন। মারা যাননি। সভ্য মানুষের বিশ্বাসে তিনি মৃত। দু'কলম পেটে পড়ামাত্রই দাম্ভিকের প্রশ্ন, হু ইজ গড। গডফড আমি মানি না। ও সব কুসংস্কার। আবার যেই বদ্যি এসে বললেন, না মশাই আমি ভালো বুঝছি না। সন্দেহ হচ্ছে ক্যানসার। একটা বায়পসি করা যাক। ক্যানসার? সে তো সারে না। আধুনিক অ্যালাপ্যাথিতে কোনও ওষুধ নেই। ভরসা দৈব। তখন নাস্তিক আস্তিক হয়ে গেলেন। পুরো বাহুতে ঝুলে গেল তাগা-তাবিজ। এসে গেল তান্ত্রিকের ওষুধ। বাড়িসুদ্ধ সবাই তখন ঘোরতর ঈশ্বরবিশ্বাসী। অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল, কোথায় সেই দৈব পুরুষ। যার অঙ্গুলিস্পর্শে দেহ রোগমুক্ত হয়। রোগের আবার মুক্তি কি? ভাইরাস অথবা ব্যাকটিরিয়া জম্পেস করে ধরেছে। এ তো বিজ্ঞান! হয় তারা ধীরে ধীরে শেষ করবে, না হয় তুমি তাদের শেষ করবে। কিছু আছে, অতি প্রবল। ধরলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু দুঃখের কথা বিজ্ঞানের বাইরেও যে অনেক কিছু আছে। যে জানে সে জানে। ভেষজ আর দৈবে যেই ক্যানসার ভালো হয়ে গেল, অভিজ্ঞ চিকিৎসক বললেন, কি জানি কি হল। আমরা তো এলেই দিয়েছিলাম। যাক সেরেই যখন গেছে তখন ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে!

জ্ঞান আপেক্ষিক! আমার জ্ঞানের চেয়ে আর একজনের জ্ঞান অনেক বেশি হতে পারে। অর্থের মত জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। আমি দুই আর দুয়ে চার শিখেছি। কোয়াণ্টাম থিওরির আমি কি বুঝবো। আমার চোখ মাইলখানেক দূরের জিনিস দেখতে পায়। শক্তিশালী দূরবীন নক্ষত্রলোকের খবর রাখে। আমি যা জানি না, আমি যা দেখি না তা নেই, এমন আমি ভাবতে পারি, তবে তা হল মূর্খের ভাবনা।

পাঁচশো বছর আগে পৃথিবী অনেক ছোট ছিল। পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরতো। মানচিত্রের অধিকাংশই ছিল রহস্যময় এলাকা। মানুষের কল্পনায় এক এক এলাকা এক একরকম চেহারা নিত। যেমন পশ্চিমী মানুষের কল্পনায় ভারত ছিল বাঘ, ভাল্লুক, রাজা-মহারাজা, যাদুকরের ভূতুড়ে দেশ। আজ আর পৃথিবীতে একটিও অজানা, অচেনা দেশ নেই। এমন কি ডার্কেস্ট আফ্রিকাও অন্ধকার থেকে আলোয় সরে এসেছে। মানুষের পাঠানো উপগ্রহ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাইরের জ্ঞান যত বাড়ছে ভেতরের জ্ঞান তত কমছে। মানুষ থেকে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, বিজ্ঞানে বিশ্বাস মানে দানবীয় আচরণ করা নয়। অনেক টাকা রোজগার, মাল খাই, মেয়েছেলে চটকাই, গোটাকতক ডিগ্রি, ডিপ্লোমা আছে, সুতরাং আমি সব জানি। আমি যা বলছি সেইটিই শেষ কথা। বুদ্ধদেব ছিলেন এসকেপিস্ট, শ্রীচৈতন্য ছিলেন উন্মাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্খ। স্বামী বিবেকানন্দ হ্যালুসিনেসানে ভুগতেন। তা হবে। একেই বলে মতুয়ার বুদ্ধি। আমি মরে ভূত হয়ে যাবো। আমার কোনও চিহ্নই থাকবে না। ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে চিতায় চাপিয়ে দিয়ে আসবে। দেহের সঙ্গে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কর্তা এসে টাটে বসবে। পাসবই হাতড়ে দেখবে জ্ঞানের ভুড়ভুড়ি ক্যাশে আর কাগজে কত রেখে গেছে। শ্রাদ্ধ একটা ঘটা করে হবে। একদল

পাড়া প্রতিবেশী হই হই করে এসে রই রই করে খেয়ে যাবে। মৃতের নিন্দে করতে নেই, তাই সকলে বলবে, আহা, এমন মালের আর দ্বিতীয় এডিশান হবে না। তা বাবা রাধাবল্লভীটা বেড়ে বানিয়েছে। একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। গরম গরম আর কয়েকখানা একবার ঘুরিয়ে দাও। আহা আলুবকরার চাটনিটা বেশ জমেছে। খেজুরে, কিসমিসে জজবজ করছে। আমি তখন ভূত হয়ে কার্নিসে বসে, বায়ুর স্বরে বলব, খুব হয়েছে ব্যাটা এবার ওঠ। বেশ সাঁটিয়েছিস। রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। যেমন ছিলুম আমি, তেমনি ছিলে তোমরা। আমি মাঝরাতে হার্টের গড়বড়িতে টেঁসে গেলুম, আর কিছুকাল থাকলে আরও কত জ্ঞান দিতুম। আরও কিছু লোককে বাঁশ দেবার ইচ্ছে ছিল। প্রাণবায়ু অসময়ে পাংচার হয়ে বেরিয়ে গেল। রাত আড়াইটের সময় এঁটোপাতা নিয়ে কুকুরের খেয়োখেয়ি। যারা গান্ডেপিন্ডে গিলে গেল তারা চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে ভুঁড়িতে বউকে দিয়ে তেল মালিশ করাতে করাতে বললে, শালারা আজ ঘুমের বারোটা বাজালে। ঘুম না হলেই কাল সকালে বদহজম। একে নিরামিষ, তায় ঘুম নেই। শ্রাদ্ধে মাছমাংস করলে ক্ষতিটা কি। ভূত কুকুর তাড়াতে কার্নিস থেকে নেমে এলো। ফল হল উল্টো। কুকুর স্পিরিট চেনে। তারস্বরে আরো চিৎকার জুড়ে দিল। আমার স্মৃতি ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে আসবে। অবশেষে ঝাপসা। এক ব্যাটা ছিল, এখন আর নেই। খুব রয়াবি ছিল। পাজামা আর মিহি পাঞ্জাবি পরে ছুটির দিন কাপ্তেনি করতে বেরতো। কি না জানতো, গদার থেকে রঁদা। কেবল নিজের শেষটা জানত না।

বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে বলছেন, ঈশ্বর! তিনি কে, স্বর্গে অবস্থান, না মর্তে, জানা নেই। তবে এইটুকু জানি, বিশাল এক শক্তি এই জগৎকারণের পেছনে নীরবে নিভৃতে কাজ করে চলেছে। সেই শক্তি হল চিৎশক্তি। একটা বিশাল,

বিরাট ব্রেন। কোথায় লাগে মানুষের তৈরি বৃহৎ কম্পিউটার। সেই শক্তির যৎসামান্য প্রকাশ নিউক্লিয়ার ফিউসানে, আণবিক বোমার বিস্ফোরণে। ভারতীয় ঋষির সঙ্গে তাঁরা এখন সম্পূর্ণ একমত :

He who, dwelling in all things
Yet is other than all things,
Whom all things do not know
Whose body all things are
Who controls all things from within
He is your Soul, the inner Controller,
The immortal

তপোবনচারী, ঋষিরা হাওয়া গাড়ি চড়তেন না, কোনও বড় ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন না, পাটকল, কি কাপড়কল, অতএব আমাদের মতুয়াদের কাছে তাঁরা ছিল ইললিটারেট। টাইবাঁধা অ্যাংলোর কাছে ইংরিজি খিস্তি শেখেননি। ওদিকে ইংরেজ বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণার পর বলে বসলেন, quantum theory and relativity theory-both force us to see the world very much in the way a Hindu, Buddhist or Taoist sees

The parallels to modern physics appear in only in the Vedas of Hinduism, in the ching, or in the Buddhist Sutras···

কলেজী শিক্ষার যেটুকু জিয়ার্ডিক ছিবড়ে ভেতরে আছে সেইটুকু সম্বল করে জগৎকারণের অনুসন্ধান। তেরো বাই বারো মাপের ঘরে একটা খাট। খাটে পনেরো টাকা দামের একসপোর্ট কোয়ালিটি বেডশিট। নিলামে কেনা রাজ্যের ফার্নিচার। তাকে সাজানো গোটাকতক পেপারব্যাক। এই মঞ্চে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছি, আমি এক জ্ঞানদাস। মাউথপিস একবার ঘুরছে এঁচড়ে-পাকা

ছেলের দিকে, আর একবার খেঁকুরে মার্কা স্ত্রীর দিকে। বিনা প্রতিবাদে এই সব প্রাণী ছাড়া কে আমার কথা শুনবে। আমার তখত-এ-তাউস, পাড়ার চায়ের দোকান, অফিসের টেবিল। ওখানে বসে আমি ফুটবল খেলি। বেকেনবাওয়ারের খেলার ভুল ধরি। ওইটাই আমার ক্রিকেট পিচ। অলিম্পিক ক্ষেত্র। ওইখানে বসে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বানাই। ওইখানে বসে এক এক দিকপাল লেখককে তুলি আর ফেলি। ইন্দ্রিয়ের ঘুলঘুলিঅলা এই ঋষির পীঠস্থান, তপোবন হল চায়ের দোকান, অফিসের টেবিল, বন্ধুর বৈঠকখানা। বিজ্ঞানের খবরও রাখি না। আধ্যাত্মিকতার ধারও ধারি না। বিজ্ঞানী চেপে ধরলে কুঁই কুঁই। অতি বিজ্ঞানীর সামনে অধোবদন। তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভেতর ধরা পড়ে যায়। থরে থরে সাজানো অন্ধকার। সেই দৃষ্টির সামনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হতে হতে একেবারে পিপীলিকাবৎ। তখন আর নিজেকে খুঁজে পাই না।

সেই ঘটনাটি মনে পড়ছে। ভূমিকম্পে জনপদ দুলছে। সমস্ত মানুষ ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ফড়িং-এর মত একটি লোক খুব বীরত্ব দেখাচ্ছে। ভূমিকম্প! ভয়ের কি আছে! ন্যাচারাল ফেনোমেনা। কয়েক সেকেণ্ড দুলেই থেমে যাবে। পাশে দাঁড়িয়েছিল এক বৃদ্ধ, তিনি মৃদু হেসে বললেন, ছোকরা, সবই তো বুঝলুম, তবে কোনও রকমে প্যাণ্টটা যদি পরে আসতে পারতে। একেবারে উদোম হয়ে বেরিয়ে এসেছ!

ঈশ্বর। তিনি কে জানি না। এটুকুও যদি জানতুম, বৃহতের পদতলে আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ এক।

৭

এই দুনিয়ায় মা ছাড়া আমাদের আর কে আছে! ভাষাহীন পশুর কণ্ঠেও মা ডাক। অতি স্পষ্ট সে ডাক। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। এ সব প্রাচীন পৃথিবীর কথা। একালে অচল। দশটি মাস মাতৃগর্ভে বসবাস করেছি। অজ্ঞান অবস্থায় সেবা নিয়েছি। বাল্যে বাঁদরামি করে জীবন অতিষ্ঠ করেছি। যৌবনে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে দূরে চলে যাব, এই তো নিয়ম। তখন আর বৃদ্ধা মাতার খোঁজ কে রাখে! তখন তো ওয়াইফ। গিন্নি। গিন্নি ছাড়া চোখে সরষে ফুল। প্রাণপ্রিয়া তুমিই আমার সব। বুড়ী মা! বড় বক বক করে। খিট্‌খিটে। অসহ্য। ঈশ্বর কবে যে তুমি বুড়ীকে নেবে!

মা জানেন, মায়ের কি বরাত! তবু নারীকে মা হতে হয়। সৃষ্টিকর্তার এই বিধান। নইলে সৃষ্টি যে লোপাট হয়ে যায়! পশুর বোধ-বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম। মাতৃত্বের আকাঙ্খা থাকে কি-না জানা নেই। অমোঘ জৈব নিয়মে মা হতে হয়। মা হবার পর তার অন্য চেহারা। যে কুকুরটি সামান্য কিছু খাবার প্রত্যাশায় আমাদের বাড়িতে নিত্য আসা-যাওয়া করত, একদিন আমাদের কয়লার ঘরে তার তিনটি বাচ্চা হল। আমরা জানি না কখন তার বাচ্চা হয়েছে। রাতের দিকে তাকে বিদায় করার জন্যে খুব হইচই হচ্ছে। অন্ধকার কয়লার ঘরে গেড়ে শুয়ে আছে। কিছুতেই উঠছে না। অসহিষ্ণু অধিকার সচেতন, স্বার্থপর মানুষ, যে আর্ত কোনও মানুষকে ঘরের দরজা খুলে দিতে কুণ্ঠিত, অন্ধকার কয়লার ঘরে সে কেমন করে একটা রাস্তার কুকুরকে সহ্য করবে। ঠ্যাঙা, লাঠি,

শাবল যাবতীয় হাতিয়ার বেরিয়ে পড়ল। রোজ যে বাড়ি থেকে খাদ্য পায়, সেই বাড়ির প্রতিটি মানুষের প্রতি এই ব্রাত্য কুকুরের অসীম আনুগত্য। কুকুর তো আর মানুষ নয়, যে উপকারীর হাড় দিয়ে চামড়া দিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাবে! কুকুরকে খোঁচানো হচ্ছে, সে ফ্যাল-ফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে সজল চোখে তাকাচ্ছে। আধো আলো, আধো অন্ধকারে তেমন বোঝা যাচ্ছে না, রহস্যটা কি। মানুষের সংসারে সবাই তো আর শুধুই প্রেমিক, প্রেমিকা কি ঘাতক নয়। মাও আছে। যিনি আঁতুড়ে সন্তান কোলে এক মাস বসে এসেছেন। তিনিই শেষে আবিষ্কার করলেন, পপি মা হয়েছে। তিনটি নবজাতককে বুকের আশ্রয়ে রেখে শীত আগলাচ্ছে। উচ্ছেদ-কারীরা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। মানব মাতা সেই পৌষের শীতরাতে এগিয়ে এলেন সারমেয় মাতার তদারকিতে দু'জনেই দু'জনকে বোঝে। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হতে চায় তার কি বেদনা! মানুষের চারপাশে আরও অনেক মানুষ। অভিজ্ঞ ডাক্তার। ব্যয় বহুল নার্সিংহোম। বেওয়ারিশ একটি কুকুরের কে আছে। ওপরে আকাশ, নিচে জমি। চতুষ্পদ একটি খোলে জীবন নামক বস্তুটির ধুকপুকুনি। যিনি সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তিনিই রক্ষক, তিনিই সংহারক। কুকুরের জন্যে চটের আচ্ছাদন এল। বাচ্চা ছেড়ে নড়ার উপায় নেই বলে নিজের ভাগের দুধ এসে গেল। মধ্যরাতে তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, কাল তোর জন্যে আরও বেশি ভাত নোবো। এই সময়টায় বড় খিদে পায় রে। মানুষেরও পায়, তোদেরও পায়। মানুষ বলতে পারে, তোরা বলতে পারিস না।

দু'জনের. দুই মায়ের এই নিভৃত আলাপন বাতাস শুনে গেল। শুনল নিশুতি বাগানের গাছপালা। আর হয় তো শুনলেন তিনি, যাঁর অস্তিত্ব সর্বত্র। যিনি এক হাতে জন্মের বীজ ছড়াচ্ছেন, আবার অন্য হাতে শুষ্ক প্রাণ কুসুম তুলে তুলে ডালিতে রাখছেন। যাঁর সৃষ্টিতে গরল আছে, অমৃত আছে। রক্ষক আছে, ভক্ষক আছে।

মাতৃস্তন আছে, পুতনার স্তনও আছে। পাশে পাশে একই সঙ্গে ঘুরছে বন্ধু আর শত্রু। বিশ্ব জুড়ে চলেছে বিচিত্র খেলা। যার যে খেলাই হোক, মায়ের খেলারই জয় জয়কার। ঘাতক, তুমি কত মারবে? বিরূপ প্রকৃতি তোমার ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্লাবন, ভূমিকম্প, সৃষ্টিকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দিতে পারবে কি! হলাহলের শক্তির চেয়ে অমৃতের শক্তি অনেক বেশী। দয়ার কাছে নিষ্ঠুরতা পরাভূত। মানুষকে চেষ্টা করে নিষ্ঠুর হতে হয়। উত্তেজক পদার্থ খেয়ে স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করতে হয়। বুকে ছুরি বসাবার আগে হাত কাঁপে। ঠেলে ফেলে দেবার সময় বুক কাঁপে। হাত ধরে টেনে তোলার সময় বিবেক স্তম্ভিত হয় না। আগুন লাগা ঘর থেকে সন্তানকে উদ্ধারের সময় মায়ের চেতনা থাকে না। নিজের নিরাপত্তার বোধ সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়ে। স্রষ্টার সৃষ্টিচেতনা এতই প্রবল সংহারের রূপ সেই চেতনার কাছে নিতান্তই ম্লান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিরোশিমা, নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা, স্মৃতিতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। মৃত্যুর কালো স্লেট মুছে মুছে জীবন অনবরতই খইয়ের অক্ষরে সৃষ্টির কথা লিখে চলেছে। তা যদি না হত, পৃথিবী এত দিনে কবরে ছেয়ে যেত। সংখ্যালঘু ঘাতকের দল সব মানুষের চিতা জেবলে সোল্লাসে নৃত্য করত।

আমি একবার এক হুলোর পাল্লায় পড়েছিলুম। ঠিক আমি পড়িনি, পড়েছিল আমার সেই মিনিটা যেটাকে আমি এক বর্ষার সকালে উদ্ধার করেছিলুম একটা বাগান থেকে। এইটুকু একটা বাচ্চা। জলে ভিজে ঘাসের মধ্যে পড়েছিল তুলোর তালের মত। ঠাণ্ডায় চোখ দুটো বুজে গেছে। কোনও এক নিষ্ঠুর, কাণ্ডজ্ঞান-হীন মানুষ বাচ্চাটিকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, নিজের সুখ বিপন্ন হবে ভেবে। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। তার সুখে বিরাট একটা থাবলা মারার ক্ষমতা নেই। অসাবধানে রাখা এক টুকরো মাছ কোনওদিন হয় তো খেয়ে ফেলতে পারত। মধ্যবিত্তের এক চুমুক দুধের আধ চুমুক হয়

তো তুলে নিত। মানুষের ধারণা পৃথিবীটা তার বাপের সম্পত্তি। তার সুখ হরণকারী কোনও প্রাণীর বাঁচার অধিকার নেই। অথচ বোকা মানুষ জানে না, সে যখন শীতের লেপের তলায় পরম সোহাগে সুখের স্বপ্নে বিভোর, তখন হয় তো লিভারের এক কোণে ক্যানসারের মৃদু চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। তেইশে ডিসেম্বর যে মানুষ লেপের তলায় আমার আমার করছে, পরের বছর তেইশে ডিসেম্বর সে শেষ শয্যায় কাতরাচ্ছে, আর বলছে, সব তোমার তোমার। এক টুকরো মাছ খেয়েছিল বলে বেড়াল কুপিয়েছিল। কাপে এক ইঞ্চি দুধ কম হয়েছিল বলে আগুন জ্বালিয়েছিল। এখন সব খাদ্যবস্তু চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে যায়, কিছু করার উপায় নেই। অতৃপ্ত বাসনা নাচাতে চায়, দেহ যন্ত্রণা রাশ টেনে রেখেছে। যে চোখে লালসা নাচত সে চোখে মৃত্যুর ছায়া। যার নিজের জীবন এত ঠুনকো, সে অন্য জীবন সম্পর্কে এত উদাস কেন।

পৃথিবীর যেমন নিয়ম, এক মানুষ মারতে চায়, আবার আর এক মানুষ বাঁচাতে চায়। সেই বেড়াল ছানাটি ক্রমে সাদা ধবধবে, সুন্দরী এক পুষির চেহারা নিল। যিনি মারতে চেয়েছিলেন, তিনি জানতেন না কি সৌন্দর্য লুকোনো ছিল এই সৃষ্টিতে। মানুষের সমাজে যেমন মাস্তান আছে, বেড়ালের সমাজেও সেই রকম মাস্তান আছে। একদিন দুপুরে আচমকা ভীষণ ঝটাপটি। মার মার করে তেড়ে যাওয়া হল। পেল্লায় এক হুলো, বাঘের মত মুখ, পুষিটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেল। ঈশ্বরের যেমন বিধান। স্বজাতির হাতে স্বজাতি ধ্বংস। একদিকে হুলো তক্কে তক্কে ঘোরে আর একদিকে আমরা। পুষির গলায় বিশ বাইশ গজ লম্বা শাড়ির পাড় বাঁধা। বাইরে যাবার পথ বন্ধ, ঘোরা ফেরা ওই বিশ বাইশ গজ বৃত্তের ভেতর। মাঝে মধ্যে মাপা বৃত্তের পরিধি ছোট হয়ে যায়। চেয়ার পায়ায় জড়িয়ে মড়িয়ে পাড়টাকে এতটুকু করে গলা টান করে

বেকায়দায় বসে থাকে। জীবকে প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে আগলে রাখতে গিয়ে আমাদের হিমসিম অবস্থা। এত সতর্কতার মধ্যে একদিন হুলো এসে বাঁধা বেড়ালকে খাবলে দিয়ে গেল। মারার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়, এত ত্বরিত তার আসা যাওয়া। চিতা-বাঘের মত চলন বলন।

এইবার ঘটনা চরমে উঠল। রাতে বিছানায় পুষি আমার কোলের কাছে শুয়ে আরামে ঘড়ঘড় করে। ভাবে মশারির ঘেরাটোপে বেশ নিরাপদে আছে। এ ভুল একদিন ভেঙে গেল। মাঝরাতে অন্ধকার ঘরে মশারির ভেতর শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই চলেছে। প্রথমে ভাবলুম ডাকাত পড়েছে। মশারির একটা পাশ ছিঁড়ে ঘাড়ে লোটাচ্ছে। ব্যাপারটা কি? অন্ধকারে চোখ ধাতস্থ হলে বুঝতে পারলুম, মশারির ভেতর দুটো বেড়াল। একটা সেই হুলো। অন্ধকারে পেটাতে গিয়ে ভুল হয়ে গেল। চিতাবাঘের মত হুলো ক্ষিপ্রগতিতে জানালা গলে পালাল, মার খেয়ে মরল পুষি। পরের দিনই সমস্ত জানালায় জাল লাগিয়ে দিলুম। খরচ নেহাত কম হল না। তবু তৃপ্তি, পুষি এখন হুলোর আক্রমণ থেকে নিরাপদ।

জানালার প্রবেশপথ বন্ধ হলেও হুলো একদিন ফাঁক পেয়ে দরজা গলে কোন সময় ঢুকে পড়ল। কেউই আমরা লক্ষ্য করি নি। ঢুকে খাটের তলায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। তখন প্রায় রাত এগারোটা। এই সুযোগ। এবার ব্যাটাকে বেধড়ক ধোলাই লাগাতে হবে। পালাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। লাঠি, শোঁটা, ঝ্যাঁটা, ডাণ্ডা, সব বেরিয়ে পড়ল। আজ হুলো নিধন হবে। সারা বাড়ি তোলপাড়। প্রথমে শুরু হল খোঁচানো। খোঁচা খেয়ে বেরিয়ে এল। দু চার ঘা ঘাড়ে পড়ল। প্রাণ ভয়ে ছোটাছুটি। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে। আমাদের উল্লাস তখন দেখে কে? বাইসন শিকারী গুহামানবের মত। হুলো লাফ মেরে জানালায় উঠল। গলে পালাতে চায়। জালে পথ বন্ধ। খুঁচিয়ে ধপাস করে মেঝেতে

ফেলা হল। গুটিসুটি মেরে পালাতে চাইছে। চারপাশে উদ্যত লাঠি। ক্ষুদ্র শত্রু। প্রবল আক্রমণকারী। মার মার চিৎকার। বাতাসে লাঠিতে লাঠি ঠেকে যাচ্ছে। বেড়াল এবার প্রাণ ভয়ে এক লাফে দরজার পাল্লার ওপর উঠে প্রাণ ভয়ে ঝুলতে লাগল। লাঠির খোঁচায় আবার তাকে মেঝেতে ফেলা হল। এবার আর সে পালাবার চেষ্টা করল না। সোজা এসে আমার পায়ে পড়ল। নড়েও না চড়েও না। করুণ চোখ দুটো একবার মাত্র আমার দিকে তুলে নিচে নামিয়ে নিল। সে চোখে জল। যেন বলতে চাইছে, মারলে মারো, রাখলে রাখো। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল। নিজের চোখেও জল এসে গেছে।

সংসারে যিনি মা, তিনি অবশেষে এগিয়ে এলেন। সেই মারাত্মক হুলো যে সুরে ডেকে উঠল তাতে স্পষ্ট মা ধ্বনি। হুলোকে বোঝান হল, পুষিকে আর কোনও দিন মারবে না। তারপর তাকে দুধ দেওয়া হল। ভয়ে খেতে চাইছে না। আমাদের ওপর হুকুম হল, তোমরা জল্লাদরা সব সরে যাও। আমরা সরে যেতেই হুলো চকচক করে দুধ খেতে শুরু করল।

সেই হুলো পরিবারেরই একজন হয়ে উঠল। সকাল, সন্ধ্যে তার মা, মা ডাক। নিজের মা কোথায় তার ঠিক নেই। মা খুঁজে পেল মানুষের শরীরে। শেষে এমন পোষ মানল, একদিন ম্যাও ম্যাও করতে করতে আমার পেছন পেছন দোকানে চলল। লোকে অবাক। এ আবার কি রে বাবা! কুকুর নয় বেড়াল চলেছে পেছন পেছন।

কোনও এক রাতে, পাহাড়ি নদীর ধারে নির্জন এক আশ্রমে বসে আছি। মহাপুরুষ বললেন, কিছু শুনতে পাচ্ছ?

মাঝে মধ্যে নদীর কুলুকুলু ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। চারপাশে অসীম প্রশান্তি। বড় বড় তারা মাথার ওপর ধক্ ধক্ করছে। বললুম, নদীর কুলুকুলু।

তোমার এখন মৃত্যুর কথা মনে হচ্ছে, না সৃষ্টির কথা।

মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, মনে হচ্ছে প্রাণতরঙ্গ বয়ে চলেছে কুলুকুলু করে। মনে হচ্ছে মমতা মাখান দুটি হাত নিভৃতে বসে বসে, নিজের খেয়ালে একের পর এক সৃষ্টি করে চলেছে। অন্ধকার আকাশে যাঁর মুখের ছায়া তিনি রুদ্র নন গৌরী। যে পৃথিবীর ঘাস এত সবুজ, আকাশ এত নীল সে পৃথিবী তো প্রেমিকের সৃষ্টি।

সর্বত্রই পূর্ণতার পরিকল্পনা। বছর যেই শেষ হল বনভূমি সেজে উঠল নবীন সাজে। এক রাতেই রিক্তপত্র গাছে বিন বিন করে নতুন পত্রোদ্গম। কোথাও কোনও বার্ধক্যের চিহ্ন নেই। এখানে ক্ষয়, ক্ষয় নয়। রূপান্তর মাত্র। সৃষ্টির পুনর্বিন্যাস। যাকে আমরা ধ্বংস বলে মনে করি প্রকারান্তরে তা সৃষ্টিরই খেলা। প্লাবন না হলে ভূমি পলি সঞ্জীবিত হবে না। হিমবাহ ভেঙে না পড়লে নদী ধারা পাবে না। বজ্রের ধমকে ফসলের ক্ষেতে নাইট্রোজেন নামবে। জীবের মৃত্যু হল অন্য জীবের ধারণ ব্যবস্থা। আমি মরব, তুমি মরবে, মানুষ কিন্তু মরবে না। বিশালের বিশাল ব্যবস্থা। সৃষ্টি একাধারে জনক জননী, জায়াপতি, তনয় তনয়া। কখনও চপল, কখনও গম্ভীর, কখনও বিশালের চেয়েও বিশাল, কখনও বালুকণার চেয়েও ক্ষুদ্র। হিমালয়, আলপস, কি পামিরের বিস্তার দেখলে বুক কেঁপে যাবে। মহাসমুদ্রে মোচার খোলায় ভাসিয়ে দিলে হৃদস্পন্দন থেমে যাবে। মহাকাশে বেলুনে বেঁধে ছেড়ে দিলে নিজেকে মনে হবে কীটস্য কীট। নিচে পড়ে আছে তাসের ঘরবাড়ি। কীটের অহমিকা। ক্ষুদ্র পাখি পাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে বলবে—কি হে মানব! কোথায় গেল তোমার বিশাল আস্ফালন। সংসারের চাতালে দাঁড়িয়ে কর্কশ হুঙ্কার। সমুদ্রতটে বিশাল ঝাউয়ের তলায় দাঁড়িয়ে অনুভব করা যায়, মানুষ সৃষ্টিতে তুমি বড় ক্ষুদ্র। তুমি এভারেস্ট নও, প্রশান্ত মহাসাগর নও, তুমি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন বনভূমির সুবিশাল গর্জন গাছ নও, এমন কি তুমি ক্ষুদ্র

পাখির উদার মুক্তির আনন্দও দেহসীমা দিয়ে ধরতে পার না। তুমি তাহলে সৃষ্টির কোন প্রয়োজনে এসেছ!

জেনে রাখো, তুমি হলে সাক্ষী-পুরুষ। তুমি অনুভব করবে বলেই সৃষ্টির নাভিপদ্ম থেকে উঠেছ শতদলের মত। কোটি, কোটি জোড়া চোখ দিয়ে দেখেও, দেখার শেষ নেই। তোমাকে মন দেওয়া হয়েছে সূক্ষ্ম অনুভূতি ধরার জন্যে। অনুভবে তুমি বিশাল, সূক্ষ্মতায় তুমি বিশাল। তুমি কখনও পিতা, কখনও ভ্রাতা, কখনও সন্তান, কখনও বন্ধু।

সেই মহাপুরুষ বলেছিলেন, চল্লিশ পেরলে বুঝবে সংসার যেমন মায়ার খেলা, তেমনি মায়ের খেলা। নিজের স্ত্রীতে যেদিন মাতৃ-দর্শন হবে, সেদিন বুঝবে প্রেমের আসল চেহারা কি! মহামায়া মহাকালী নিজের কোলে শিবকে ফেলে সন্তান স্নেহে স্তন্যপান করাচ্ছেন। সৃষ্টির মুহূর্তে কাম। আমি বহু হতে চাই। পর মুহূর্তেই আমি ধারক, আমি পালক। যিনি কন্যা, তিনিই জায়া, তিনিই জননী। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কণ্ঠে এক ডাক মা। জীবজগতের সমস্ত প্রাণিকণ্ঠে সেই এক নাম মা। আমি ধারণ করে রেখেছি তাই তোমাদের জীবন উল্লাস। আমি ঘাতকের মা, পাতকের মা, সাধকের মা।

৮

গাছের পাতা আছে। সারা বছরের স্মৃতি নিয়ে সব পাতা একদিন ঝরে যায়। আবার নতুন পাতা আসে। আবার ঝরে যায়। এই ভাবেই চলতে থাকে গাছ যতদিন বাঁচে। মানুষের পাতা নেই। মানুষের পাতা হল তার জীবনের মুহূর্ত। জীবন থেকে অনবরতই মুহূর্ত ঝরে চলেছে দুঃখ-সুখের স্মৃতি নিয়ে। চলার পথে জমছে। অদৃশ্য কিন্তু অনুভব করা যায়। চলতে গেলে মচমচ শব্দ হয় না ঠিকই, তবু একেবারে নীরব নয়। কান পাতলে অতীত থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

রাতের মেল ট্রেন ছুটছে দুলেদুলে, পাহাড় পর্বত নদী নালা ডিঙিয়ে। ষষ্ঠীর দিন। বাঙলার দুর্গামণ্ডপে ঢাকে কাঠি পড়েছে। আকাশে প্যাঁজা তুলোর মত শরতের মেঘ। একফালি চুষে খাওয়া লেবু-লজেনসের মত চাঁদ মাটির কাছে ঝুলছে। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। পুজোর ছুটিতে কলকাতা চলেছে বেড়াতে। ঠাসা ভীড়। আমরা চার কলেজীবন্ধু, এপাশে ওপাশে, মাথার ওপর দুটো বাঙ্কে পা ছড়িয়ে বসে আছি। তারস্বরে গান চলেছে। কখনও রবীন্দ্র-সংগীত কখনও হিন্দি ছায়াছবির হিট গান। বেপরোয়া চার যুবক। ভবিষ্যতের স্বপ্ন চোখে। কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। দুর্ভাবনা নেই। অর্থনৈতিক দাসত্ব নেই। কামরায় তিলধারণের জায়গা নেই, তবু আমাদের কি উল্লাস। একেবারে নীচের আসনে পাশা-পাশি দুটি মেয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছে। আমাদের গান আর কথা বলার উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। যার ভাণ্ডারে যত রসিকতা আছে সব উজার করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিযোগিতা চলছে চারজনে। স্বয়ম্বর সভায় যেন চার রাজপুত্র। রাজকন্যার মালা জিতে নেবার জন্যে অলিখিত, অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওই ভীড় ট্রেনে সেই দোলায়িত রাত যেন স্বপ্নের রাত, আরব্য রজনীর রাত।

ভোরবেলা জানলা গলে আমরা চার পরাজিত রাজপুত্র যশিডী স্টেশানে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। সামনেই অস্পষ্ট আলোয় ঘুমন্ত একটি পাহাড়। গায়ে কুয়াশা হাত বুলোচ্ছে। কেমন একটা শীত শীত ভাব। রুক্ষ. পাহাড়ী মাটি। একটি দুটি পাখি থেমে থেমে ডাকছে। বন্ধ কামরা থেকে একেবারে মুক্ত প্রকৃতির কোলে। ট্রেন নিচের বাঙ্কে ঘুমন্ত মেয়ে দুটিকে নিয়ে পাটনার দিকে চলে গেল। এতক্ষণ ধরে মৃদু চালসে ধরা আলোয় রোমান্সের যে জাল বোনা হয়েছিল তা ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল। আমরা আর প্রতিদ্বন্দ্বী নই। প্রাণের বন্ধু। ভোরের নীলচে আলোয় অদৃশ্য কালির লেখার মত চারপাশের দৃশ্য ফুটে উঠছে। টাঙা চলেছে আমাদের চারজনকে নিয়ে রিখিয়ার দিকে। ইউক্যালিপটাসের গন্ধ ভেসে আসছে।

বহুকাল আগে ঝরে গেছে জীবনের সেই সব মুহূর্ত। সেই চার বন্ধুকে কোথায় ছিটকে গেছে আজ। কোনও যোগাযোগ নেই। সেই স্বপ্নের মেয়ে দুটি সেই ট্রেনের সঙ্গে সেই যে হারিয়ে গেল আর দেখা হলো না কোনও দিন। বয়েস বেড়ে গেল, চুল পেকে গেল, মন বদলে গেল। স্বাধীন, স্বপ্নময় ছাত্রজীবন দাসজীবন হয়ে গেল। যা চাওয়া হয়েছিল, তার কিছু পাওয়া গেল, কিছু পাওয়া গেল না। এখনও প্রতি রাতে হাওড়া থেকে সেই ট্রেন ছাড়ে। সেই একই ভীড়। ওপরের দুটি বাঙ্কে কেউ না কেউ থাকে। যশিডী স্টেশানে নেমে টাঙা চেপে কেউ না কেউ রিখিয়ায় যায়। আমিও যেতে পারি, তবে সে অন্য আমি। তরুণ নয়, প্রবীণ আমি। আমার পাশে আমার সেই তিন বন্ধু থাকবে না। নিচের বাঙ্কে সেই মেয়ে দুটি

থাকবে না। ঝরা পাতা যেমন গাছের ডালে আবার আটকে দেওয়া যায় না, ঝরা মুহূর্তও তেমনি জীবনে আর জুড়ে দেওয়া যায় না। যা গেল তা গেল।

একবার দেরাদুন থেকে কলকাতা আসার পথে সাহারানপুরের কাছে কি একটা ছোট গ্রামের পাশে ট্রেন বিকল হয়ে গেল। আমার সহযাত্রী ছিলেন এক বাঙালী ব্যারিস্টার। তাঁর সে রকম অহমিকা ছিল না। ভীষণ আমুদে মানুষ ছিলেন। গোটা চারেক ভাষায় অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা। আদর্শনিষ্ঠ। আমার হাতে ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনী দেখে বললেন, 'ও সব নেগেটিভ বই পোড়ো না। মানুষের পরমায়ু খুব বেশি নয়, অথচ ভালো ভালো বইয়ের সংখ্যা এত বেশি, এক জীবনে পড়ে শেষ করা তো যাবে না, পড়তে হলে বেছে বেছে সেই সব বই পড়ো, মনের উন্নতি হবে।' মানুষকে যাঁরা সৎ পরামর্শ দেন তাঁরা মহান। কুপথে নিয়ে যাবার সঙ্গী অনেকে আছে, সুপথের সঙ্গী লাখে এক। মানুষটির আরও পরিচয় পেলুম অন্য একটি ঘটনায়। ইংরেজিতে বলে টিট ফর ট্যাট অর্থাৎ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। পাশের কুপের এক অবাঙালী ভদ্রলোক জানলার রেলিং-এ ভিজে গামছা বেঁধে দিয়েছিলেন। বাতাসে সেই গামছার ঝাপটায় আমরা জানলার ধারে বসতে পারছিলুম না। আমার সেই সহযাত্রী উঠে গিয়ে অনুরোধ জানিয়ে এলেন, গামছাটা খুলে নিন। কোনও ফল হল না। তখন তিনি সুটকেস থেকে একটা কাঁচি বের করে কচাৎ করে গামছার যে অংশটা আমাদের ঝাপটা মারছিল, কেটে ফেলে দিলেন। পরিণাম যাই হোক না কেন, তাঁর নীতি ছিল যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

যখন জানা গেল ট্রেন ঘণ্টা চারেকের জন্য রুকে গেল, তখন আমরা দু'জন নেমে পড়ে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগলুম। আমগাছ, জামগাছ, পথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে গমের ক্ষেতের পাশ দিয়ে। ছোট্ট একটি মন্দির। মহাবীর দাঁড়িয়ে আছেন পর্বত কাঁধে।

একেবারেই দেহাতি গ্রাম। কোথাও কিছু নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা প্রাইমারি স্কুলের কাছে চলে এলুম। প্রধান শিক্ষক ক্লাস ছেড়ে এগিয়ে এলেন। খুব খাতির করে আমাদের বসালেন। এমন কি লাড্ডু আর চা খাওয়ালেন। জীবনের কিছু মুহূর্ত সেখানে পড়ে আছে। যা আর তুলে আনা যাবে না। ট্রেন হয়তো রোজই ওই গ্রামের পাশ দিয়ে আসে, গ্রামের হয়তো আরও উন্নতি হয়েছে, প্রাইমারী স্কুল হয় তো হাই স্কুল হয়ে গেছে। সেই বয়স্ক প্রধান শিক্ষক হয় তো আর নেই, আর কোথায়ই বা আমার সেই ব্যারিস্টার সহযাত্রী। সব পেছনে ফেলে আমার সময়ের রেলগাড়ি সোজা এগিয়ে চলেছে। রোজই তাতে নতুন যাত্রী, নতুন কথা, নতুন ভাবনা।

যে হুলোটির কথা আগের লেখায় লিখেছি সেই হুলোটি এই মাত্র মারা গেল। বাগানের গুমটি ঘরের ছাদে তার মৃতদেহ পড়ে আছে। পরশুদিন তাকে খাইয়ে দাইয়ে রাত এগারোটা নাগাদ দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যবিত্তের সাজানো সঙ্কীর্ণতায় উটকো একটা বেড়ালকে আশ্রয় দেবার উদারতা নেই। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় কে এসে বললে, হুলোটা বাইরে পড়ে আছে, ভীষণ অসুস্থ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। একটা স্ট্রেচার মত করে বেড়ালকে তুলে আনা হল। ওষুধ এল, পথ্য এল, সারারাত ধরে পরিচর্যা চলল। গুমটি ঘরের ছাদ হল তার হাসপাতাল। কম্বল চাপান হল, তার ওপর প্ল্যাস্টিকের আচ্ছাদন। শীতও পড়ল জবরদস্ত। চারপাশ হিঁহিঁ করছে। কুয়াশায় প্রকৃতির যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। গাছের পাতার খাঁজে খাঁজে কান্নার জল জমেছে। সামান্য একটা ইতর প্রাণীর জন্যে প্রকৃতির এত বেদনা! না শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের নিষ্ঠুরতায় অশ্রু বিসর্জন! কে বা কারা ইঁট মেরে হুলোর পেছনের পা দুটো ভেঙে দিয়েছে। শুধু তাই নয় বিষ খাইয়ে দিয়েছে। এই বিশাল বিপুল নিষ্ঠুর পৃথিবীতে

তুচ্ছ একটা বিড়ালের বাঁচার অধিকার নেই। বেড়াল জীবনের শেষ কয়েকটি মুহূর্ত পড়ে রইল ওই গুমটি ঘরের ছাদে। আর কোন দিন সে মা মা করে পায়ে পায়ে ঘুরবে না। আমার পেছনে পেছনে দোকান পর্যন্ত পোষা কুকুরের মত ছুটবে না। অন্য বেড়াল হয় তো আসবে ; কিন্তু তাদের ডাক আলাদা, স্বভাব আলাদা। তার সমস্ত মুহূর্ত আমার ঝরা মুহূর্তে হারিয়ে গেল। আমি যতদিন বাঁচব ততদিন ওই গুমটি ঘরের ছাদের দিকে তাকালেই দেখতে পাব একটি মৃত বেড়ালের অর্ধনির্মিলিত চোখ। আমার হাতের টর্চের আলোয় স্থির। কলকে গাছের একটি ডাল ঝুকে আছে মাথার ওপর। ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ছে সময়ের বিলাপের মত।

কতদিন ভেবেছি জীবনের সুখের কি দুঃখের মুহূর্ত যদি ইচ্ছে মত ফিরিয়ে আনা যেত! এই তো কিছুদিন আগে আমরা জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। আমি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, বিমল দেব, মনোজ মিত্র। তিস্তালজের একটি ঘরে সকাল হচ্ছে। মনোজবাবু বিছানা থেকে কম্বলের পাহাড় নিয়ে উঠে বসলেন। প্রভাতী চা এল। তারপর আমরা দু'জনে সারা জলপাইগুড়ি শহরটা পদব্রজে চষে এলুম। মনোজবাবু বাঁধের ওপর একটা সিকি কুড়িয়ে পেলেন। বিশাল বিশাল কৃষ্ণচূড়া নীল আকাশে ঝাড়ু মারছে। রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে লুচি খাওয়া, গরম চা। সেলুনে দাড়ি কামানো। সেই সেলুনে আবার পটের মত এক সার ছবি ঝুলছে। একটু বেলার দিকে জলপাইগুড়ি কলেজের একদল ছাত্রীর আগমন। প্রাণচঞ্চল, প্রশ্নে প্রশ্নে ভরপুর। একেবারে কোরকের মত। বহু শীত, বহু গ্রীষ্ম, বর্ষার মাজাঘষায় জীবন রঙচটা হয়ে যায়নি। সারি সারি কপালে সারি সারি টিপ। ছোট টিপ, বড় টিপ।

সদলে মধুর টি-এস্টেটের ডাকবাংলোয় রাত একটায় যেন স্বপ্ন

দেখছি। সবুজ লনে আলোর পিচকিরি। হিহি শীত। পরের দিন রাত দেড়টায় কম্বলমুড়ি দিয়ে কাঁসাচিনি ফরেস্টে পাগলা হাতি দেখতে যাওয়া। কথা বলায় বুদ্ধদেববাবুর ধমক, "চোপ, জঙ্গলে কিছু দেখতে হলে কথা বলা চলে না।" ঘোর অন্ধকারে এক ডজন মানুষ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে। প্রাচীন অরণ্যের বুক চিরে পথ চলে গেছে সিঁথির মত। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পিংপং বলের মত জোনাকি ভাসছে। পাতার শব্দ হলেই বুক কেঁপে উঠছে, ওই রে পাগলা হাতি। রাত আড়াইটার সময় বাংলোয় খেতে বসে চা-বাগানের সেক্রেটারির অতিথি আপ্যায়নের আন্তরিকতা। স্যুপে মরিচ নেই বলে কর্মচারীদের ধমকধামক। নিঃশব্দে পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে অক্ষপথে। রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত। প্রকৃতিতে কত বিশাল ঘটনা ঘটে চলেছে। আর বিন্দুর মত স্থানে, তিলের মত কিছু প্রাণী নিজের তৈরী নিরাপদ সীমানায়, মরিচ মরিচ বলে উতলা হচ্ছে।

হাজার চেষ্টা করলেও ওই সব মুহূর্ত আর ফিরবে না। সুনীলবাবুর সেই গান দুটি, যে দুটি গান গেয়ে সমরেশ বসু মহাশয়ের জন্মদিন পালন করা হল ঠিক রাত বারোটায়, 'আশালতা, কলমিলতা ভাসছে অগাধ জলেতে।' আর 'এবার মরলে সুতো হব।' অনুরোধ করলে তিনি যে-কোনও দিন গাইতে পারেন, কিন্তু ঠিক ওই দিন, ওই সময় যেমন লেগেছিল, তেমন কি আর লাগবে? মনোজবাবু আবার দুটি গানকে এক করে, অদ্ভুত এক টু-ইন-ওয়ান বানিয়েছিলেন। স্মৃতিতে সব চালান হয়ে গেছে। চোখ বুজলে দেখা যাবে বাংলার সদাশিব নাড়ুবাবু সমরেশবাবুর দিকে একগুচ্ছ মধ্যরাতের শিশির ভেজা ফুল এগিয়ে দিচ্ছেন। সে অনুভব কিন্তু মনের চোখে!

আমরা দুঃখে ফিরে যেতে চাই, সুখে ফিরে যেতে চাই, যে হাত ধরে শৈশবে মেলায় ঘুরেছি সেই হাত আবার ধরতে চাই, যে আমায়

কাঁদিয়েছে তাকেও চাই, যে আমায় হাসিয়েছে তাকেও চাই, যে চোখে ভালবাসার প্রথম শিখা কেঁপেছে তাকেও চাই। চাই কিন্তু পাই না। অন্ধকার নিস্তব্ধ অরণ্যের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকা, ফেলে আসা পথে চলতে গেলে শুধু মচমচ শব্দ। সবই মৃত। অতীত মৃত, ভবিষ্যৎও মৃত। মুহূর্ত নবীন হয়েই প্রবীণ হয়ে যাচ্ছে। এ বড় জ্বালা। এ এমন এক রেলগাড়ি যা থামতে জানে না, যার কোনও স্টেশান নেই। যাত্রীরা সব মৃত মুহূর্ত। তবু কোনও অপরাহ্ণ বেলায় মাটি থেকে যখন ভিজে ভিজে গন্ধ বেরোয়, পাতায় লেগে থাকে দীর্ঘশ্বাসের মত মৃদু বাতাস, তখন দূরের পানে তাকিয়ে আমরা প্রতীক্ষা করতে পারি, জীবনে এমন কিছু আসুক যা হারায় না। জীবনের একমাত্র সত্য অপেক্ষা।

৯

বহুকাল আগে একটি গল্প পড়েছিলাম। আজকাল পাঠ্যপুস্তকে তেমন গল্পের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এখানকার স্কুল বালকরা অনেক বিজ্ঞ। তাদের মগজে দুধের দাঁত পড়ার আগেই গভীর জ্ঞান কংক্রিট মিকশ্চারের মত ঠেসেঠুসে একটি ঢালাই তৈরি করার চেষ্টা চলে। ইনটেলেকচুয়াল ভাস্কর্য।

সেই গল্পটি ছিল এই রকম। একটি রাজত্বে যে কোনও একজন মানুষকে রাজা করা হত। ধরো আর সিংহাসনে বসিয়ে দাও, রাজমুকুট পরিয়ে। তা একদিন এক পথিককে ধরে এনে বলা হল, আজ থেকে তুমি হলে এই রাজত্বের রাজা। সে তো অবাক। পথ থেকে একেবারে সিংহাসনে! বেশ মজা তো! পথিক জিজ্ঞেস করলে, তা কতদিনের জন্য আমাকে রাজা করা হবে? যতদিন বাঁচব ততদিন? না, একদিনের রাজা?

না, নিয়ম হল, তুমি একদিনের জন্যে নয়, এক বছরের জন্যে রাজা হয়ে থাকবে।

তারপর তোমাকে এক দ্বীপে নির্বাসিত করা হবে।

পথিকের পালিয়ে যাবারও উপায় নেই। ধরা পড়ে গেছে। অগত্যা সিংহাসনে রাজা হয়ে বসতেই হল।

রাজা একদিন পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে যে দ্বীপে নির্বাসিত করা হবে তুমি সেই দ্বীপটা জানো?

হ্যাঁ, মহারাজ জানি।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

দ্বীপ খুব দূরে নয়। একদিন রাতে সেই পরিচারকের সঙ্গে নৌকো করে গিয়ে রাজা চুপি চুপি দ্বীপটি দেখে এলেন। নির্জন

একটি ভূখণ্ড। বেঁচে থাকার কোনও আয়োজনই সেখানে নেই। রাজা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একবছর পরে মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রকৃতি নিরস্ত্র মানুষকে ক্ষমা করে না। খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই, পানীয় নেই।

মানুষটি কিন্তু দমে গেল না। এক বছরের রাজা রোজ রাতে সবার অলক্ষ্যে সেই দ্বীপে যেতে লাগলেন। সময় থাকতে থাকতেই শুরু করে দিলেন বেঁচে থাকার আয়োজন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল বাসস্থান। তৈরি হল খাদ্যসম্ভারের মজুত ভাণ্ডার। পানীয়ের আধার।

এদিকে বছর ঘুরে গেল। শেষ হয়ে গেল রাজত্বকাল। সিংহাসনচ্যুত রাজা চলেছেন নির্বাসনে। কোমরে দড়ি। চার পাশে প্রহরী। সকলে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, এযাবৎ যত রাজা নির্বাসনে গেছেন, সকলেই গেছেন কাঁদতে কাঁদতে, ইনি চলেছেন মহানন্দে, প্রফুল্লবদনে।

কৌতূহলী একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ভয় করছে না। সামনেই তো আপনার মৃত্যু!

উত্তরে মৃদু হেসে রাজা বললেন, সময় থাকতেই আমি যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

আমরা ক'জন ভবিষ্যতের ভাবনা তেমন করে ভাবি! আর ভাবলেই বা কি করতে পারি। প্রাচ্যচিন্তায় ভবিষ্যতের ভাবনা আছে। পাশ্চাত্যচিন্তায় ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের আদর্শ হল পশ্চিম। বর্তমানই হল সব। কালকের কথা যারা ভাবে তাঁরা দুর্বল। গেঁয়ো। জিও পিও। ইংরেজ সঞ্চয়ের ধার ধারে না। আজ রাজার মত বাঁচো। কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।

কোকিলকে ডেকে কাক বললে, ভাই খুব তো কুহু কুহু করে কালোয়াতি করছ। একটা বাসা-টাসা বানাও না। কোকিল বললে, ওসব আমার স্বভাবে নেই, ধাতে সইবে না। আমার ডিম আছে,

তোমার বাসা আছে। আমি পাড়বো, আর বোকা তুমি তা দিয়ে মরবে। কোকিলের জন্যে কাক আছে মানুষের জন্যে কে আছে?

অর্থের চেয়ে বড় সম্পর্ক। জনৈক নাস্তিক পণ্ডিত বলেছিলেন, ঈশ্বর, ভাগ্যে এসব আমি মানি না। তবে জেনে রাখো, তুমি আর তোমার জগৎ মুখোমুখি। জগতের সামনে নিজেকে হাজির করার ওপর নির্ভর করছে তোমার ভাগ্য। নিজেকে ঘৃণিত করলে তুমি ঘৃণিত, নিজেকে ভালোবাসার পাত্র করতে পারলে সকলের স্নেহধন্য। কারুর মৃত্যুতে পাড়া ভেঙে পড়ে, কেউ মরলে কাঁধ দেবার লোক জোটে না। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—অ্যাজ ইউ সো, সো উইল ইউ রিপ? যেমন বীজ ছড়াবে ফসলও উঠবে তেমন। মেয়েলি প্রবাদ, দুনিয়া হল আয়নায় মুখ দেখা।

তিব্বতীয় এক সাধুর জীবনের ঘটনা মনে পড়ছে। গুরুর নির্দেশে সাধু ছিলেন দীর্ঘ নির্জন-সাধনায়। নির্জন খুপরিতে বসে বছরের পর বছর ধ্যান করতে করতে তিনি অলৌকিক দৃশ্য দেখতে শুরু করলেন। একটি মাত্র দৃশ্য! সেটি হল একটি মাকড়শা। ধ্যানে বসলেই তাঁর আবির্ভাব। প্রথম আবির্ভাব ছিল ক্ষুদ্র। দিনে দিনে তা বড় আকারে দেখা দিতে শুরু করল। শেষে তার আকার দাঁড়াল সাধুর আকারের মত। শুধু তাই নয়, মাকড়শাটি সাধুকে ভয় দেখাতে শুরু করল। সাধু ছুটলেন গুরুর কাছে, কি করব গুরুজি?

গুরু বললেন, এরপর যেদিন মাকড়শাটা আসবে, তুমি তার পেটে একটা ঢ্যারা আঁকবে, হাতে নেবে একটা ছুরি, তারপর বেশ ভালো করে ঢ্যারার মাঝখানটা লক্ষ্য করে ফ্যাঁস করে বসিয়ে দেবে ছুরি।

পরের দিন সাধু প্রস্তুত হয়েই ধ্যানে বসলেন। যথারীতি সেই ভয়ঙ্কর বিশাল মাকড়শার আবির্ভাব। সাধু সঙ্গে সঙ্গে পেটে ঢ্যারা আঁকলেন। তারপর বেশ দেখেশুনে ছুরি চালাতে গিয়ে কি মনে

করে নিচের দিকে তাকিয়ে অবাক। এ কি ঢ্যারাটি যে তাঁর নিজেরই পেটে আঁকা। ছুরি বসাতে হলে যে নিজের পেটেই বসাতে হয়। তাহলে মানুষের ভেতর কোনটা আর বাইরেটাই বা কি? মানুষের ভেতর এইভাবেই অসতর্ক মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে এসে ভয় দেখাতে থাকে। বাইরেটাকে মারতে হলে ভেতরটাকেই মারতে হয়।

আমাদের ঘৃণা. আমাদের অহঙ্কার আমাদের নিজেকেই ঘৃণিত করে তোলে। নিঃসঙ্গ করে দেয়। দু'জন মাননীয় মানুষ। দুই বন্ধু। একজন আর একজনকে বলছেন, তোমার ভাই সুখের সংসার। স্ত্রী. পুত্র, পরিবার, পুত্রবধূ সকলকে নিয়ে কেমন সুখে আছ। রাতে বাড়ি ফিরে একসঙ্গে বসে টি ভি দেখছ। একই টেবিলে বসে একসঙ্গে হই হই করে খানা খাচ্ছ। সকালে পুত্রবধূ অফিসে আসার আগে হাতে টিফিন কৌটো এগিয়ে দিচ্ছে। তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়। আমার বাড়ি নয় তো, আতঙ্ক। ঢুকতেই ভয় করে। সুইট হোম নয় বিটার হোম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। যখন দেখি এবার রাস্তায় ঘুরলে পুলিসে ধরবে তখনই বাড়িমুখো হই। সুখী ভদ্রলোক তাঁর দুঃখী বন্ধুকে বললেন, একটি মাত্র কথাই বললেন, আমার সুখ আমি নিজের চেষ্টায় অর্জন করেছি ভাই। তুমি সংসারের জন্যে কি করেছ যে সংসার তোমাকে সুখী করবে? ভদ্রলোক নিরুত্তর। অতীতে প্রসারিত দৃষ্টি। অসংখ্য ভুলে ভরা জীবন।

বিশাল এক ব্যক্তি ছিলেন আমার প্রতিবেশী। বিরাট চাকরি। ঝকঝকে গাড়ি। সুন্দর বাড়ি। রোজ রাতে প্রচণ্ড মদ্যপান করে ফিরতেন। ছেলেরা চ্যাংদোলা করে বাপকে গাড়ি থেকে খালাস করে দোতলার বিছানায় নিয়ে গিয়ে ধপাস করে মালের মত ছুঁড়ে ফেলে দিত। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে তেড়েফুঁড়ে খাড়া হবার চেষ্টা করলেই ছেলেরা ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করে দিত। ভদ্রলোকের রাত কাটত আর্তনাদে। সারারাত যন্ত্রণায় আক্ষেপ, বাবারে, মারে। অবসর

নেবার পর বছরখানেক বেঁচে ছিলেন অসংলগ্ন এক সংসারে বিদেশীর মত। দোষ কার? রামপ্রসাদ থাকলে বলতেন, দোষ কারো নয় গো মা/আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

এই যে মায়ের সঙ্গে বউয়ের তিক্ত সম্পর্ক, শেষে ছেলের বউ নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া, এ কি খুব সুখের! কেন এমন হয়! এ ঘটনা শিক্ষিতের সমাজেই বেশি ঘটে। ছেলেরা যত সহজে মেয়েদের বশ্যতা স্বীকার করে মেয়েরা কি তত সহজে করে! বিয়ের পরও মেয়েদের বাপের বাড়ির আকর্ষণ কমে না। আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই। বাপের বাড়ির টানটাই বেশি। ছেলে এদিকে বউ বউ করে নিজের গর্ভধারিণীকে গাদায় ফেলে দিলে। এক বৃদ্ধা আক্ষেপ করে বললেন, মা হল মাগী, আর বউ হল মা। হায় কলি! জনৈক রসিকপ্রবীণ বলেছিলেন, যেদিন দেখবে বালক গৃহভৃত্য চুলে আলবোট কেটে শিস দিয়ে ঘুরছে সেদিন বুঝবে তার হয়ে গেছে। আর যেদিন শুনবে তোমার ছেলে শ্বশুরমশাইকে তোমার সামনে বাবা, বাবা করছে, সেদিন থেকে তাকে খরচের খাতায় লিখে রাখবে। কলির শেষপাদে যা হবে তার বর্ণনায় এই লক্ষণই আছে, পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত হবে। প্রকাশ্য-স্থানে নারীপুরুষ মদ্যপানে বেহুঁশ হবে! সমস্ত খাদ্যবস্তু তার স্বাদ হারাবে। ঋতুর কোনও ঠিক থাকবে না। গুণীর কোন কদর থাকবে না। মাস্তানে দেশ ভরে যাবে। কথায় আছে কাঠ খেলে আংরা দাস্ত হবে।

আবার একটি গল্প মনে পড়ছে। এক যুবক এক যুবতীর প্রেমে পাগল। বিয়ে করতে চায়। মেয়েটির একটি মাত্র শর্ত, তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি, যদি তুমি তোমার মায়ের হৃদয়টি কেটে এনে আমাকে উপহার দিতে পারো। ছেলেটি বাড়ি ফিরে এসে নিদ্রিত মায়ের হৃৎপিণ্ডটি ছুরি চালিয়ে বের করে আনল। কোনও বাধা পেল না। কী আনন্দ! প্রেমিকা এখন তার হাতের

মুঠোয়। সেই রাতেই মাঠময়দান ভেঙে যুবক ছুটল প্রেমিকার কাছে তার প্রার্থিত উপহার নিয়ে। অন্ধকার রাত। এবড়োখেবড়ো জমি। হোঁচট খেয়ে যুবক ছিটকে পড়ল। মায়ের হৃদপিণ্ডটি হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। অন্ধকারে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে যুবকটি শুনল, মায়ের কণ্ঠস্বরে কাটা হৃৎপিণ্ড বলছে, বাবা খুব লাগেনি তো!

মানুষ থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে সমাজ, সমাজ থেকে জাতি, জাতি থেকে জাতিপুঞ্জ। আমাদের রক্তে ঢুকে আছে সমাজবন্ধতা, জাতিবন্ধতার বীজ। অস্বীকার করলেই আমরা একক। নিঃসঙ্গতায় সুখ নেই। আমার অতীত তৈরি করছে আমার বর্তমান। সারা জীবন সকলকে বলেছি তফাৎ যাও, এখন কাছে এসো বললে কে আসবে! অতীতে নিজের সেবাই করেছি, এখন কে আমার সেবা করবে! অতীতে নিজের অহংকারের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন কে আমায় সঙ্গ দেবে! হেট বিগেটস হেট, লাভ বিগেটস লাভ। অসংলগ্ন সংসারের আর্তনাদ চারপাশে। ক্লিন্ন পারস্পরিক সম্পর্ক। পাড়ায় পাড়া নেই। সংসারে সংসার নেই। জীবনে জীবনানন্দ নেই। প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান নেই। সুখ বস্তুটিই উধাও। ঐশ্বর্য আছে। কেতা আছে। আর আছে বিলিতি কায়দার ওলড-এজ হোম। আর আছে করুণ সুর—হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল/পার করো আমারে॥

১০

গম এ হস্তী-কা, অসদ, কিস-সে হো জুজ মর্গ ইলাজ। শমা হর রঙ্গ-মে জলতী হৈ সহর হোনে তক॥

। গালিব।

ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, মানে একটি সংসারের সুরু। সানাই বাজতেও পারে, নাও পারে। আলোর ঝালরে গৃহ সাজতেও পারে নাও পারে। সাড়ম্বরে অথবা অনাড়ম্বরে সংসারের সূত্রপাত এই ভাবেই হয়ে আসছে। একটি রাতের খেলা। শ্রাবণের কোনও বর্ষণ রাত হতে পারে। বসন্তের কোনও উতলা রাত হতে পারে। শামিয়ানার তলায় ছায়া ছায়া আমন্ত্রিত কিছু মানুষ? আলোর বৃত্তে কিছু উড়ন্ত পোকা, সিগারেটের পাক খাওয়া ধোঁয়া। কলা-পাতায় ফুলকো লুচি, টিকিঅলা ঝুল কালো বেগুন ভাজা। বালি কিচকিচে মরসুমী শাকভাজা, এক হাতা মুগেরডাল, সমাহিত মাছের মাথার ভগ্নাংশ, রোরুদ্যমান পাকা পোনার গোটা দুই খণ্ড, বিমর্ষ মাংসের টুকরো, স্বচ্ছ চাটনিতে পেঁপের ওড়না, চতুষ্কোণ সন্দেশ, বর্তুলাকার রসগোল্লার মলিন মুখচ্ছবি। ত্রিকোণ পান মুখে অভ্যাগতদের সউদগার বিদায়। মধ্যরাতে কুকুরের চিৎকার, এঁটো পাতা নিয়ে টানাটানি। সুচারু শয্যায়, রজনীগন্ধার বাস নিতে নিতে এক জোড়া মানবমানবীর তরণী ভাসানো। একবার সুখ এসে হাল ধরে তো, দুঃখ এসে সে হাত সরিয়ে দেয়। বন্ধন ক্রমশই দৃঢ় হতে থাকে। জীবনে জীবন মিলে যায়। নতুনের গন্ধ মুছে যায়। জড়তা কেটে আসে।

ডুরে শাড়ি মোড়া যৌবনে বার্ধক্যের ছায়া নামে। দুই ইতিমধ্যে তিন, তিন থেকে চার, চার থেকে পাঁচ হয়ে যায়। নিচের দিক যত

ভরাট হতে থাকে ওপর দিক তত খালি হতে থাকে। শ্বশুর মহাশয়, 'তোমরা সব সুখে থাক,' বলে একদিন বিদায় নিলেন। বিদায় নিয়ে গেলেন শাশুড়ী। সেদিনের নব দম্পতি হয়ে গেলেন কত্তা, গিন্নি। চারপাশ মা, মা ডাকে সরব। বিদায়ী কর্তার আসনে নতুন কর্তা। বিয়ের রাতেব সিল্কের পাঞ্জাবিটি পোকায় ফুটোফুটো করেছে। সোনাব বোতাম স্থান নিয়েছে গয়নার বাক্সে। মনে মনে প্রস্তুতি চলছে মেয়ের বিয়ের। কত্তাব যৌবনের লম্বা হাত খাটো হয়েছে। মুখের হাসিব বহব কমেছে। যে চোখে চশমা ছিল না সে চোখে চশমা এসেছে। সামনের চুল পাতলা হয়েছে। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। সময়ের ট্র্যাক্টার জীবনের ক্ষেতটিকে কুদলে দিয়েছে। ফসল কি উঠেছে, তা আর ভেবে দেখার সময় নেই। প্রেমের কথা স্বপ্নেব কথা সব ফুরিয়ে গেছে, এখন শুধু কাজের কথা, কর্তব্যের কথা। সব খেলাই এখন মধ্য মাঠে, আত্মরক্ষার খেলা।

মধ্যবিত্তের আশা, আকাঙ্খা খুবই সামান্য। আকাশ ছোঁয়া কিছু নেই। কেউ রেসের ঘোড়া কিনে ডার্বি জিততে চায় না। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে সিংহ শিকারের বাসনাও নেই। সাতমহলা ইন্দ্রপুরীর স্বপ্নও কেউ দেখে না। পোয়াভর পাত্রে জীবনের মাপামাপি। লটারিতে হঠাৎ ছিয়াত্তর লাখটাকা পেয়ে গেলে অনেকে হয় তো মারাই যাবেন। ইচ্ছা পূরণের দেবতা হঠাৎ যদি সামনে এসে প্রশ্ন করেন, 'বলো তুমি কি চাও? তোমার তিনটি বাসনা আমি পূর্ণ করব। মধ্যবিত্ত থতমত খেয়ে যাবেন। ভেবেই পাবেন না, ঠিক কি চাই। শেষে বলবেন, 'হে দেবতা, বিকেলের দিকে আমার গৃহিণীর চোরা অম্বল আর আধকপালেটি চিরতরে দূর করে দাও। এই হল আমার এক নম্বর প্রার্থনা। দু'নম্বর, ছেলেটিকে একটা ভাল চাকরি পাইয়ে দাও। তিন নম্বর, মেয়েটির জন্যে একটি ভাল পাত্র জুটিয়ে দাও। চতুর্থ আর একটি ইচ্ছা আছে প্রভু, সেটি হল, না ভুগে, না ভুগিয়ে আমি যেন করোনারি থ্রম্বোসিসে দুম্

করে মরে যেতে পারি।'

যে যেখানে আছে, সে সেখানেই থাকতে চায়। সেইখানেই রেখে যেতে চায় উত্তর পুরুষকে। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, পিতা অবসর নেবার পর, পিতার সেরেস্তাতেই পুত্রের চাকরি মিলত কর্মচারীর সন্তান হিসেবে। এখনও হয় তো কোথাও কোথাও এই নিয়ম চালু আছে। কেরানীর ছেলে কেরানী। কম্পাউণ্ডারের ছেলে কম্পাউণ্ডার। ঠেলে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও উপায় নেই। স্বপ্ন দেখা যায়। জাগরণের বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়। খাঁচার পাখির মাপা আকাশ। বিশাল আকাশে উড়তে গেলেই ডানা বেঁধে যায়।

মাছউলীকে রাজা খাতির করে সুরভিত ঘরে, সুন্দর পালঙ্কে শুতে দিলেন। প্রহরের পর প্রহর চলে যায়, ঘুম আর আসে না। শেষে মাছের চুবড়িটি জলে ভিজিয়ে এনে মাথার পাশে রাখল। সেই পরিচিত গন্ধ। ধীরে ধীরে ঘুম এসে গেল।

পাঁচতারা হোটেলে মধ্যবিত্তকে ছেড়ে দিলে তার অবস্থা হবে গরম টিনের চালে বেড়ালের মত। কার্পেটে জুতোসুদ্ধ পা তোলার আগে বকের মত থমকে দাঁড়াবে। তারপর একপাশ দিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটবে চোরের মত। যদি বলা হয় কার্পেটের দাম দশ হাজার টাকা, তা হলে পা দিয়ে নয়, হাঁটু দিয়ে হাঁটার চেষ্টা হবে। খাবার টেবিলে ভোজের আয়োজন দেখে হাত গুটিয়ে আসবে। কার পর কি খেতে হয় জানা নেই।

ধনীর বাথরুমে ঢুকে জনৈকের প্রাকৃতিক কর্ম মাথায় উঠে গিয়েছিল। তার নিজের শয়নকক্ষের দ্বিগুণ আয়তন। চতুর্দিকে ঝকঝকে পালিশ করা। রুপোর মত ঝকঝকে বাথরুম ফিটিংস। হাত দেবার আগে নিজের হাত দেখতে হয়। হাতের ময়লায় পালিশ না নষ্ট হয়ে যায়। বিশাল বাথটাবে গণ্ডা কয়েক কলের মুখ, পাইপের কারিকুরি। বাথটাব যেন বিলাসী বৃদ্ধ। আয়েস করে

শুয়ে আছে। মেঝেতে এক ফোঁটা জল ফেলতে সঙ্কোচ হয়। দেয়ালের গায়ে ওয়াটার হিটার। কলের গায়ে লেখা 'হট' আর 'কোল্ড'।

মধ্যবিত্তের গৃহিণী দেড় হাজার টাকা দামের শাড়ি উপহার পেয়েছিলেন। সে শাড়ি একবার পরেই, খুলে তুলে রাখতে হল। কোথাও বসতে গেলেই ভয় হয়, এই বুঝি দাগ লেগে গেল। চলতে গেলে ভয় হয়, এই বুঝি খোঁচা লেগে গেল। সে শাড়ি তোলাই রইল, বছরের পর বছর। পরা আর হল না। তিনশো টাকা দামের বিলিতি সেণ্ট প্রদর্শনীর বস্তু হয়ে আলমারির গর্ভকোষেই মজুত রয়ে গেল, ব্যবহার করার সাহস হল না। এক ফোঁটার দাম কত সে হিসেব আজও মেলেনি! বড় জটিল গণিত।

যার যে মাপের চলন, সে সেই মাপেই পা ফেলবে। সুখের সংজ্ঞা যেমন সীমিত, সমস্যার বেশির ভাগই ছ্যাঁচড়া সমস্যা। কল, জল, আলো, দুধ, তেল, তেলে ভাজা, ইলেকট্রিক বিল, মশামাছি, তেলা-পোকা, হাঁচি, কাশি, সর্দি, পালাজ্বর, চুল উঠে যাওয়া, চোখ বসে যাওয়া, বায়ু, পিত্ত, মাছের দাম, আলুর দাম, ধুলো, ধোঁওয়া, বাড়িঅলা, ভাড়াটে। যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত যীশুরা আলপিনের খোঁচায় মরমরো।

এরই মধ্যে সাধ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ। শিশুর আগমন। হাম, হামা। যকৃৎ বিবৃদ্ধি, হাতেখড়ি, বিদ্যারম্ভ। কিল, চড়, কানমোলা, মৃদু ধোলাই, আড়ং ধোলাই। কান্না, হাসি, বায়না। কখনও সোনার চাঁদ, মানিক আমার, কখনও গেছো হনুমান। পূর্ব-পুরুষ যত পাকছে, উত্তর পুরুষ ততই ডাঁসছে। ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা স্পষ্ট হচ্ছে। গলায় বয়সা ধরছে। মা বাবা ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। বাইরের পৃথিবী এগিয়ে আসছে। প্রথমে গোপনে ধূমপান। ক্রমে প্রকাশ্যে। দৃষ্টি তেরছা হচ্ছে। মেয়েদের দিকে তাকাবার ধরন পাল্টাচ্ছে। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে'র' নীতিতে

সংসার সব মেনে নিচ্ছে।

অবশেষে 'অল রোড লিড্স টু রোম'। পিতা ছিলেন কালেক্টরির বড়বাবু। ছেলে ব্যাঙ্কের কেরানী। বছর না ঘুরতেই ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ। আবার সেই হলুদ নিমন্ত্রণ পত্র। নতুন সিল্কের পাঞ্জাবি। এক সেট সোনার বোতাম। এক জোড়া নিউ-কাট। যুগ পাল্টেছে। ভিয়েনের বদলে ক্যাটারার। বাঁধা মেনু। কড়া পরিবেশন। সামান্য অদলবদল ; কিন্তু সেই এক রাত। নতুন খাটে নতুন বিছানা। মসৃণ চাদর। রজনীগন্ধা একদিন সুবাস ছড়িয়ে শুকিয়ে যাবে। নবাগতার রঙীন ডুরে শাড়ি ধীরে ধীরে রঙ হারাবে। মৃদু চলন, মৃদু ভাষণ ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হবে। বধূর ঘোমটা খসে, মাতা। সংসারের প্রাচীন মাতাটি ক্রমে ক্রমে অন্তরালে অস্তমিত হতে থাকবেন। একটু একটু করে তাঁর সব অধিকার চলে যাবে অন্যহাতে। এরপরেই ওঁ গঙ্গা। যে খোঁটার সঙ্গে জীবন-তরণী বেঁধেছিলেন, সেই খোঁটাটি কালের নদীতে ভেসে যাবে। শূন্য শয্যায় দীর্ঘ একটি পাশবালিশ। ক্ষয়ে যাওয়া এক জোড়া চপ্পল। পুরু লেন্সের চশমা। গোটা দুই ধর্মপুস্তক। কয়েকটি ওষুধের ফাইল নীরবে তাকিয়ে থাকবে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার দিকে। কেউ বুঝবে না তাঁর বেদনা। সংসার কখনই তেমন মরমী নয়। হাঁসের মত। পালকে জল ধরে না। বেদনার খোঁচা সময়ের শানে পড়ে মোলায়েম হয়ে আসে। কোনও যাওয়াই দীর্ঘকাল মনে রাখা যায় না। আগমনের চাপে নির্গমনের বেদনা মুছে যায়। ঝুল ঝাড়তে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে যায় এক সার ছবি। অন্ন-প্রাশনের আসনে টোপর মাথায় শিশু ক্রমে প্যাণ্ট পরা কিশোর। কিশোর থেকে যুবক। স্বামী স্ত্রী। বৃদ্ধবৃদ্ধা। শেষে একজন আছেন আর একজন নেই। অবশেষে দুজনেই ওঁ গঙ্গা। গালিবের মত বলতে ইচ্ছে করে।

হস্তী হৈ নহ কুছ অদম্ হৈ, গালিব।

আখির তো কেয়া হৈ, অয় নহী হৈ ?
সব আছে, না কিছুই নেই, গালিব ?
শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী ? নাকি কোনো ব্যাপারই নেই ?
[অনু: আবু সয়ীদ আইয়ুব]

জীবনের শেষটা সকলেরই ভারি নিঃসঙ্গ। পাশের খেলার মাঠে তাদের উল্লাস, যারা নতুন এসেছে। রেফারির বাঁশি বাজাচ্ছে দূরে গাছের পাতা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। কৃষ্ণকলি ফুটেছে, রাত ভোর হবার আগেই ম্লান হবার জন্যে। পাশের ঘরে নাতিরা গোল হয়ে বসেছে ক্যারামবোর্ড ঘিরে। স্ট্রাইকারের শব্দ হচ্ছে খটাস খটাস। পুত্রবধূ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে টিপ আঁকছে সুচারু করে। টিভির পর্দায় যিনি গান গাইছেন, তিনি বছর পাঁচেক আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। ছায়া শরীর, ছায়াকণ্ঠ পড়ে আছে।

জীবনের সব কাজ শেষ হয়ে গেলে কেমন লাগে ? সেই সব কাজ, যা আর নতুন করে শুরু করা যাবে না। শুধু অপেক্ষা। হয় ক্ষণ অপেক্ষা, নয় দীর্ঘ অপেক্ষা। অপেক্ষা বড় ক্লান্তিকর। গাছ তলায় প্রেমিকের অপেক্ষা। রোগীর ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা। বিদেশ থেকে ছেলের চিঠি আসবে তার অপেক্ষা। দুর্যোগের রাতে প্রিয়জন ঘরে ফেরেনি তার অপেক্ষা। পদশব্দ শোনা গেছে, কখন কে আসে, বড় উৎকণ্ঠা। সময়কে তখন বড় দীর্ঘ মনে হয়। শেষ বেলার ছায়ার মত।

কাছের মানুষ তখন অনেক দূরের। শব্দে নৈঃশব্দ্য। জীবনেই মৃত্যু। হাতের মুঠো খুলে খুলে মুহূর্তের পাখিরা অনবরতই উড়ে চলেছে। কাউকেই আর ফেরানো যাবে না। যাহা যায়, তাহা যায়। শূন্য এ বুকে যতই ডাকো না কেন পাখি আর ফিরবে না। গালিব সাহেবের মতই বলতে ইচ্ছে করবে: বাদ্‌হ আনে-কা বফা কীজীয়ে ; য়েহ্‌ কেয়া আন্দাজ হৈ,

তুম-নে কিঁউ সঁওপী হৈ মেরে ঘর-কী দর্‌মানী মুঝে ॥
আসবে ব'লে কথা দিয়েছো, কথা রাখো ;
এ কেমন রীতি তোমার,
আমাকে আমারই দরজায়
দরোয়ানির কাজ দিয়েছো কেন ?
[অনু ঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব]

১১

শীত তাহলে সত্যিই এবার বিদায় নিল। যাক বাবা বাঁচা গেল। রোজ সকালে গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢাললেই পিলে চমকে যেত। কেমন একটা মৃত্যুর চিন্তা আসত। মনে হত কেউ যেন কফিনে পুরে সাত হাত মাটির তলায় ধীরে ধীরে নামিয়ে দিচ্ছে। কানের কাছে অস্পষ্ট স্বরে কেউ যেন বলে চলেছে, রাম নাম সৎ হ্যায়। এই শহরের পক্ষে শীতই ভালো। আমরা মা ষষ্ঠীর কৃপায় সংখ্যায় মন্দ বাড়িনি। গিজ গিজ করছি চারপাশে দ্বিপদ পোকার মত। বাসে ট্রামে মাখোমাখো জয়নগরের মোয়ার মত নিত্য আসা যাওয়া। সহনশীল বাঙালী। সাত চড়েও রা কাড়িনা। নাকে কাঁদি না। আমরা বড় হয়েছি না! এখন কি আর বাসের জন্যে, ট্রামের জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করা সাজে। পরিবহণ মন্ত্রী কি বলবেন? কি বলবেন পথমন্ত্রী, পরিবেশ মন্ত্রী, পুরমন্ত্রী? শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ঝটাপটি, লেগে যাবে। কি শেখালেন মশাই বুড়ো খোকাদের? এখনও প্রথমভাগোক্ত সুবোধ বালকটি হতে পারেনি। যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। ধেই ধেই নৃত্য।

গ্রীষ্মে বাস অথবা ট্রাম অথবা ট্রেনের ভেতর জঠরাভ্যন্তরের উত্তাপে মানুষ সেদ্ধ হয়ে যায়। শীতে মোটামুটি আরামেই থাকা যায়। রামের ঘাড়ে শ্যাম, শ্যামের ঘাড়ে যদু। বহুকাল আগে একটা গান শোনা যেত, মনে হয় ভবিষ্যৎ কলকাতার দিকে চেয়েই লেখা হয়েছিল, ইচক দানা, বিচক দানা, লেড়কার উপর লেড়কি নাচে, কত্তা হ্যায় দিওনা। মানে বলতে পারবো না, তবে কেয়াবত গানা। আবার রিপিট ব্রডকাস্টের জন্যে রিপিটেড রিকোয়েস্ট রইল। বাস, মিনিবাস, ট্রাম, ট্রেন, স্টেশান সর্বত্র ওই গানটি

পুনরুদ্ধার করে বাজান হোক। আজকাল একরকম বাস বেরিয়েছে, যার নাম স্পেশাল বাস। কিসে স্পেশাল? না ডবল ভাড়া। আর কি স্পেশাল? না ঝুলে ছোট। ফতুয়ার মত। চালে চাঁদি ঠেকে যায়। আর? আর তার একটি কেরামতির দরজা আছে। সেই দরজার ফাংশান? বাড়তি উত্তেজনার খোরাক। প্রথমত তার কাজ হল, যে উঠছে তার পশ্চাদ্দেশে ক্যাঁত করে একটি লাথি মারা। কারণ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ না কেউ, অতি সাবধানী দরজাটি বন্ধের জন্যে হয় সবেগে ঠেলে দেবেন, না হয় টেনে দেবেন। কিংবা অভ্যাসবশে নিজেই টেনে, বাপ বলে সামনে ঝুঁকে পড়ব। প্রায়শই পরিমাণের তুলনায় বেশি মানুষ ঢুকবেন, তখন ওই দরজা কাল হয়ে দাঁড়াবে। দরজা যখন বন্ধ করতেই হবে। তখন, রাস্তার লোক ঠেলতে থাকবে, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও। যেন চেঞ্জ থেকে ফেরার সময় সুটকেসের ডালা বন্ধ হচ্ছে। যেন টিনের কৌটোয় বড়ি ঠাসা হচ্ছে। চাপের ধর্মই হল বস্তুকে ঊর্ধ্বে ঠেলে তুলে দেওয়া। দরজার কাছাকাছি কিছু মানুষ চাপের চোটে ওপরে উঠে গেলেন। পদতলে বাস নেই, বায়ু। ত্রিশঙ্কু যাত্রী অন্যের অঙ্গবাহী হয়ে প্রেমানন্দে চলেছেন। শ্রীচৈতন্যের দেশ। ব্যাটা, জগাই-মাধাই হয়ে থাকার জো আছে। চাপের চোটে প্রেম বেরোবে। ওই দরজা আবার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। নিয়ম হল, যাকে বলে, রুল অফ দি গেম, নেমেই বন্ধের জন্যে দরজা পেছন দিকে দুম করে ঠেলা। আর কেউ অন্যমনস্ক নামলে, দরজা সপাটে মুখে। এ দরজা হল আঙুল-সামাল-দরজা। একটু এদিক ওদিক হলেই আঙুল দরজার কেরামতিতে পুঁটকিপাঁট। কত রঙ্গ জানো যাদু, কত রঙ্গ জানো। ল্যাঙোটের পকেট। তা নন-স্পেশাল বাসের যদি স্পেশাল দরজা থাকে, তা হলে প্রেরণাদায়িনী ওই সংগীত কেন সর্বত্র বাজবে না! ভাড়া তাতে দুচারপয়সা বাড়ে বাড়ুক। সব রকম চাপ সহ্য করার অসীম ক্ষমতা আমাদের আছে।

শুধু একটু মিউজিক চাই। হিন্দি সিনেমায় নায়ক-নায়িকা খাবি খেতে খেতে গান গায়। পাহাড়ের মাথা থেকে আত্মহত্যার জন্যে ঝাঁপ মারে। পড়ছে তো পড়ছেই, আর সেই সঙ্গে চলেছে গান-এ দুনিয়া এ মহফেল, কুছু কামকা নেহি। ঝপাৎ। স্থলে অথবা জলে নয়, একেবারে নায়কের কোলে। সঙ্গে সঙ্গে ডুয়েট, প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া, পমপম পঁরাপম। একেবারে কাশ্মীর গুলমার্গ, খিলানমার্গ। ভূস্বর্গ তো সবেধন নীলমনি ওই একটাই।

নাঃ। শীত চলে গেল। আবার সেই আসছে-বছর। তিনি আসবেন শিশিরের বিন্দুতে, অগ্রহায়ণের কুয়াশায়। তখন কে থাকে কে টেঁসে যায়! অ্যাডমিনস্ট্রেসানের দাবি অবশ্য ডেথ-রেট কমে গেছে। দশ, বিশ, তিরিশের দশকে মানুষ যত টাঁসতো এখন আর তত টাঁসে না। তা ঠিক। নরম্যাল ডেথ আর কই। কদাচিৎ একটি দুটি বলো হরি চোখে পড়ে। বেশির ভাগই তো অস্বাভাবিক মৃত্যু। তাকে মৃত্যু বলে না। রকের ভাষায় মায়ের ভোগে যাওয়া। তান্ত্রিকের ভাষায় নরবলি। সমাজতত্ত্ববিদদের ব্যাখ্যায় প্রগতি। আমেরিকায় এই রকম হয়। ওয়ারেন বার্গারের রিপোর্ট বলছে ওয়াশিংটনের জনসংখ্যা ছ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান, সুইডেন কিংবা ডেনমার্কের জনসংখ্যা ১৮ গুন বেশি। তবু ওয়াশিংটনে খুনের হার অনেক বেশি। আমেরিকায় বছরে ২৪ হাজারের মত মানুষ খুন হয়। এই ২৪ হাজারের মধ্যে বিশ হাজারের প্রাণ যায় গুলিতে। ৬০ মিলিয়ন পিস্তল, ২০৩ মিলিয়ন অন্যান্য ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র আমেরিকানদের হাতে হাতে ঘুরছে। আমরা যদি ওই রেকর্ড ম্লান করে দিতে না পারি তবে কিসের প্রগতি। যুক্তি শাস্ত্র কি বলে? আমেরিকায় প্রতি তৃতীয় পরিবার সমাজবিরোধীদের শিকার। আমাদেরও ভাগ্যকে সেই দিকে নিয়ে গেলে আমরাও আমেরিকান। বয়েস বাড়লে যেমন গোঁফ বেরোয়, সেই রকম আমাদেরও দেশে চওড়া

চওড়া রাস্তা বেরোবে। প্রত্যেকের বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ হবে। চতুর্দিকে একেবারে জমজমাট। বিরাট বিরাট স্কাই স্ক্রাপার আকাশে মাথা ঠেলবে। ময়দান থেকে রকেট উড়ে যাবে আকাশের ঠিকানা নিতে। ফুটপাথের সমস্ত মানুষ উঠে যাবে অট্টালিকায়। সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরে ফ্রিজ থেকে ফ্রোজেন খাবার বের করে, জর্জ ওয়াশিংটন যেরকম সোফায় বসতেন সেই রকম বাঘা সোফায় বসে, চুকচুক করে খেতে খেতে কলার টিভিতে হ্যান্ড বল দেখবে। মাঝে মাঝে ভেসে উঠবে দেশ নেতাদের মুখ। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে আর মুখ বাঁকিয়ে হাসতে ইচ্ছে করবে না। সম্ভ্রমে মাথা নিচু হয়ে যাবে। পাশে থাকবে সুন্দরী বউ। পরিধানে বেনারসী। চুল ফুর ফুরে। মাথায় একটিও উকুন নেই। অঙ্গে খুচলি নেই। ঘুনসি পরা উদোম শিশুর দল নিয়ত মনে করিয়ে দেবে না, কিসের তুমি পিতা! কোথায় আমার আহার, পুষ্টি আর শিক্ষা। মনুমেন্টের তলায় ঝাণ্ডা পুঁতে, গালগলা ফুলিয়ে শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে, বক্তৃতা দিয়ে যা হল না, মাইলের পর মাইল মিছিলে মেড়ার মত ঘুরে যা হল না, অনবরত দল ভেঙে, গড়ে, পালটে যা হল না, নরবলিতে তা অবশ্যই হবে। এই আমাদের শেষ পথ, এই হল আমাদের তুরুপের তাস। হাতের কাছে যাকে পাও তাকেই মেরে যাও।

একে হত্যা বলা মনে হয় ঠিক হবে না। আমাদের ছেলেরা, স্বাধীন দেশের সোনার চাঁদ ছেলেরা, অ্যানাটমি অর্থাৎ দেহবিদ্যা শিখছে, অস্ত্রোপচার শিখছে। কচি কাটছে, বুড়ো কাটছে, জ্ঞান বাড়ছে। তা ছাড়া যারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, তাদের দিক থেকে যখন কোনও প্রতিবাদ নেই, তখন তাদের মানুষ ভাবাটা ঠিক হবে না। মানুষ হলে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াত। এক জোট হয়ে তেড়ে যেত! রোজই তো শয়ে শয়ে ছাগল কাটা হয়। কই ছাগলরা তো প্রতিবাদ করে না। তাদের বংশবৃদ্ধি তো বন্ধ হয় না। শয়ে শয়ে

ব্যা ব্যা করে পৃথিবীতে আসছে আর এক কোপে ভ্যা করে বিদায় নিচ্ছে।

যাক শীত তাহলে চলেই গেল। সোয়েটার টোয়েটার এইবার ঘুমোতে যাবে। উলবোনা কাঁটা ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে পড়ে থাকবে কিছুকাল। কপি, পালং শাক, শুঁটি, টোম্যাটো বাজার থেকে যাই যাই করছে। আসছে কচু-ঘেঁচু, কুমড়ো ভেণ্ডি। কারুর মনেই আর তেমন সুখ নেই। কখন কার ডাক আসবে জানা নেই। অপারেশান টেবিলে তুললেই হল। কাগজ খুললেই সারি সারি মুখ। সব নিরুদ্দেশ। খোঁজ মিলছে না। কে যে কোথায় চলে যাচ্ছে। এত বড় দেশ। নদী, নালা, বনজঙ্গলের অভাব নেই। তার ওপর তন্ত্রপীঠ। কাপালিকরা করাত হাতে ঘুরছে। সাধনার কি শেষ আছে রে ভাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছিলেন, সখা অর্জুন, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। মারো, মেরে যাও। তুমি মারবে কি, আমি তো সব মেরেই রেখেছি। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। তারপর এতখানি একটা হাঁ করলেন। দ্যাখো সখা, বিশ্বরূপ দ্যাখো। সেই রূপ দেখে ভয়ে অর্জুনের বুক কাঁপছে। মুখ-গহ্বরে করাল দন্ত। সেই দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে আছে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা। তাদের পক্ষে যুদ্ধে সমবেত রাজমণ্ডলী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ। তাঁদের ধড়, মুণ্ড সব আলাদা আলাদা হয়ে পড়ছে। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে দেহের অংশ আটকে আছে। অর্জুন তখন বলছেন, সখা

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি
বক্‌ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥

পতঙ্গ যেভাবে আগুনে ঝাঁপ মেরে পুড়ে মরে সেই রকম সমস্ত লোক তোমার ওই মুখে গিয়ে সবেগে ঢুকছে আর মৃত্যু বরণ করছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান
সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।

হে বিষ্ণো! সমস্ত লোককে গ্রাস করার অভিলাষে তুমি তোমার প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করে রেখেছো।

এই তো বিশ্বের রূপ, বিশ্বরূপ। ভয় পেলে চলবে না। শীত গেল, গ্রীষ্ম আসছে। বর্ষা নামবে। লোডশেডিং বাড়বে। পথে পথে মিছিল ঘুরবে—চলছে চলবে। প্রশ্ন করা বৃথা, কি চলছে, কি চলবে? সোজা উত্তর, যা চলছে তাই চলবে। বেশি ভেন্তাড়া করলেই, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

এমন কি কোনও জায়গা নেই, যেখানে অন্তত দিনকয়েকের জন্যে পালিয়ে যাওয়া যায়। এক সময় শীতে বায়ুপরিবর্তনে যাবার হিড়িক পড়ে যেত। রেলভ্রমণ তখন এত ভীতিপ্রদ ছিল না। মোজার ভেতর বা জুতার সুকতলায় টাকা ভরে, স্টেশানে রেল থামলেই ইষ্টনাম জপতে হত না। কে উঠছে? ডাকাত নয় তো! বাবু চেঞ্জে গিয়ে ফিরে এলেন সর্বস্বান্ত হয়ে। চল্লিশ বছর আগে ভারত বলতে বুঝতুম এক অখণ্ড একটি দেশ। এখন আর তা নেই। ভাবতে ভালো লাগে না, কিন্তু সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। যে বাঁধনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বাঁধা ছিল, সে বাঁধন খুলে গেছে। কি সে বাঁধন? মনে হয় বিদেশী শাসন। পরাধীনতার একটা বন্ধন আছে। যাকে কবিরা বলেছেন, দাসত্বের শৃঙ্খল। স্বাধীনতা মানে মুক্ত মানুষের উল্লাস। আমরা সবাই রাজা। আর কথাতেই আছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এক একটি প্রদেশ এক একটি স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা পেতে চায়। এক হবার সাধনা সে ছিল যখন আমরা পরাধীন ছিলাম। এখন আমাদের টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড হবার ব্যাকুলতা। এক ডজন প্রধানমন্ত্রী, দু'ডজন মন্ত্রী, অজস্র এম এল এ। কেন্দ্রটেন্দ্র সব মুছে দাও, যার যার হিস্যা বুঝে নাও।

বৃদ্ধ বললেন, গুড ওলড ডেজ আর গন। সে একটা সময় ছিল যখন রাত একটায় বসন্তের ফুর ফুরে বাতাসে আমরা বেড়াতে বেরতুম। রাতের পর রাত এই শীত আর বসন্তের মিলন ক্ষণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতুম। বড় বড় ওস্তাদের গান! শেষ রাতে স্ত্রী-পুত্র সহ বিয়ের ভোজ খেয়ে আতরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে বাড়ি ফিরতুম। দূরে ছায়ামূর্তি দেখে আঁতকে উঠতুম না, ওই রে আসছে। শীতে বেশীর ভাগ বাঙালীই যেত বাইরে, বায়ু পরিবর্তনে। এখন সব জায়গার বায়ুই দূষিত।

১২

সংসার একেবারে চিবিয়ে শেষ করে দিয়েছে। পরনে গরমের প্যাণ্ট। আকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া গরমের কোট। উভয়েই একদা কুলিন ছিল। এখন বিবর্ণ। রোঁয়া ওঠা। গলায় প্রথামত একটি টাই বাঁধা! যেন দীর্ঘ হাজত-বাসের পর মুক্তি পেয়েছে। ফাটা কলারের যুগলবন্দীর মাঝখানে মৃত পাঁঠার জিভের মত ঝুলছে নেকটাই। বয়েস হয়েছে। তাই মাথায় একটি টুপি। যেন উলের চুল গজিয়েছে মাথায়। জুতো দুপাটির এক সময় যথেষ্ট কেতা ছিল এখন আর নেই। গোড়ালির দুপাশ ক্ষয়ে গেছে। মানুষটি বড় শীর্ণ হয়ে গেছেন। দুটি চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। অফিস পাড়ার ফুটপাথ ধরে শেষ বেলায় ধীর পায়ে হেঁটে চলেছেন। গতিতে ঘরে ফেরার তেমন আবেগ নেই। তাঁকে অতিক্রম করে জনস্রোত ছুটে চলেছে। কেউ কেউ অতি ব্যস্ততায় ধাক্কা মেরে যাচ্ছে। পিঠে আঙুলের খোঁচা মেরে ধীরগামী মানুষটিকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিতে চাইছে। তিনি মাঝে মধ্যে ফিরে তাকাচ্ছেন। সে তাকানোয় ক্ষোভ নেই, উষ্মা নেই! পৃথিবীর কাছ থেকে এই যেন তাঁর স্বাভাবিক পাওনা।

এই মানুষটির নিশ্চয়ই একটি অতীত আছে। মুখ এত শীর্ণ ছিল না। মরা মাছের মত এমন চোখ ছিল না। বর্তমানে গায়ে অতীত প্রাচুর্যের স্মৃতি লেগে আছে। এই টুইডের স্যুট। জুতো, টুপি, টাই, চেহারার ধাঁচ, সব কিছুতেই অবলুপ্ত আভিজাত্যের চিহ্ন। সব ছিল, এখন আর কিছু নেই। দাঁতালো সংসার চিবিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে।

সংসার কটাহ। কার ভাগ্যে কি আছে কেউ জানে না।

ভদ্রলোকের নাম কী। হয়তো টি. সি. বোনার্জি। বাংলা নামকে একটু সায়েবী-ঢঙেই হয়তো উচ্চারণ করতেন। আইভরি ভিজিটিং কার্ডে উঁচু উঁচু অক্ষরে ওই রকমই লেখা হত। একটি কার্ড হয়তো এখনও ঢুকে আছে ওয়ালেটের অপরপিঠে। চামড়ার সংস্পর্শে দীর্ঘকাল থাকার ফলে ছাপকা ছাপকা দাগ লেগে গেছে। তবু আছে। ওয়ালেটের সোজা দিকে সোনালী মনোগ্রাম অস্পষ্ট। এক সময় জ্বলজ্বল করত টিসিবি অক্ষর তিনটি।

নিস্তারিণী অ্যাপার্টমেণ্টের সপ্তম তলে, যে নেমপ্লেটে ডি. কে. বোনার্জি নামটি ঝুলছে, তিনি কি এই টি সি. বোনার্জির বড় ছেলে? বিলেত থেকে সি. এ করিয়ে এনেছিলেন। বিয়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত স্টিভেডার পি. কে. চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রী। ভালো টেনিস খেলেন। কিং-সাইজ সিগারেট তিন টানে ছাই করে দেন। বব করা চুল। কোমরের কাছে শাড়ির প্যাঁচ বড় অস্বস্তির সৃষ্টি করে বলে, শালোয়ার কামিজ অথবা জিনস আর টি-শার্ট পরেন। শ্বশুর আর আধুনিকা স্ত্রীর চাপে সি. এ. ডি. কে. বোনার্জি বাপকে ছেড়ে সাততলার আধুনিক খোপে বাসা বেঁধেছেন। অঢেল রোজগার, অঢেল খরচ। পিতাকে পরিত্যাগের পুরস্কার হিসেবে ব্যবসায়ী দ্বিতীয় পিতা ঝকঝকে একটি প্রিমিয়ার পদ্মিনী সান-ইন-লকে উপহার দিয়েছেন। মধ্যরাতে মদের নেশায় জুনিয়ার ব্যানার্জি মাঝে মাঝে স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি সুন্দরী? তুমি তো আমার মা নও, তুমি তো আমার স্ত্রী নও!' স্ত্রীও তখন জড়ানো গলায়, অ্যাশ ট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে পোষা স্বামীটিকে তিরস্কার করে ওঠেন, 'ডোণ্ট বি, সিলি ডি. কে.।'

কে তুমি? এই তো চিরকালের প্রশ্ন। আমি কে? তুমিই বা কে? প্রশ্ন নিয়েই যাওয়া। টি. সি. বোনার্জির ব্যবসার অংশীদাররা এখন কোথায়? এক সময় লাখ লাখ টাকা কামিয়েছেন। মাইকা,

কয়লা, রবার। বিলিতি কোম্পানির এজেণ্ট ছিলেন। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। ড্যালহাউসিতে অফিসটা এখনও আছে। জনপ্রাণী নেই। ধুলো পড়া টেবল-চেয়ার, ভাঙা টাইপ-রাইটার ছেঁড়া ছেঁড়া ফাইল। বিবর্ণ নেম-প্লেট। অ্যাসেট আর কিছু নেই। সবই লায়বিলিটি। গোটাকতক মামলা ঝুলছে কোর্টে। পদ্মপুকুরের বাড়ি সেকেণ্ড মটগেজে পড়ে গেছে। ও আর ছাড়াবার উপায় নেই। ঝুনঝুনওয়ালার বংশধরেরাই ভোগ করবে। বাড়ি ছাড়া মানুষের আর কোনও যাবার জায়গা থাকলে বোনার্জি সেইখানেই যেতেন। সাধের বাড়ি এখন যেন কফিনের মত। কতকাল রঙ পড়েনি। পেলমেট আছে পর্দা নেই। ভালো ভালো ফার্নিচার বিক্রি হয়ে গেছে। একমাত্র মেয়ে আত্মহত্যা করার পর স্ত্রীর মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। মেজ ছেলেটা মানুষ হয়নি। সুসময়ের বড় ছেলে নিজের কোলে সব ঝোল টেনে নিয়ে সরে পড়েছে। মেজর পেছনে তেমন কিছু ঢালা যায়নি।

সফল মানুষের অনেক সঙ্গী থাকে। বাড়ির সামনে মুহুর্মুহু গাড়ি এসে থামছে বন্ধু নামছে, আত্মীয়-স্বজন নামছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। হাসির ফোয়ারা ছুটছে। কেক উড়ছে, প্যাস্ট্রি উড়ছে। ফুল আসছে, ফল আসছে। উমেদাররা দাদা, দাদা করছে। সহস্র এক আরব্য রজনীর জীবন। মনেই হয় না এ রজনী একদিন ভোর হবে। ঘোর কেটে যাবে।

ফেলা তাস আর তোলা যায় না। ছোঁড়া ঢিল আর হাতের তালুতে ফিরিয়ে আনা যায় না। বোনার্জি যাদের বিশ্বাস করে-ছিলেন, তারা সব মেরে ফাঁক করে দিয়েছে। যারা উপকার নিয়ে গেছে তারা আর ফিরে আসেনি। যাদের বড় আপনার, প্রাণের মানুষ মনে হয়েছিল তারা সবাই ছিল সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী। এখন আর সাবধান হবার সময় নেই।

ফার্স্ট ক্লাস ট্রামের সামনের একটি আসনে বোনার্জি ধীরে ধীরে

শরীরটিকে বসালেন। সে অহঙ্কার আর নেই। এক সময় এই রাস্তাতেই ছুটতো তাঁর ঘি-রঙের বুইক গাড়ি। পেছনের আসনে কখনও একা, কখনও সপরিবারে। সকলেরই মনে তখন প্রাণের ফোয়ারা ছুটছে। জীবন যেন হাল্কা পাখির পালক। বড় ছেলে সবে ফিরেছে। তাকে ঘিরে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেলভেট রঙের ভীমরুলের মত ভোঁ ভোঁ করছে। মেজছেলে তখনও ছাত্র। ফুটফুটে মেয়ে। সুন্দরী স্ত্রী। পরিপূর্ণ স্বপ্ন ঘেরা একটি পরিবার। বোনার্জির স্যুটের তখন কি চেকনাই। দুটো চোখ নাচছে খঞ্জন পাখির মত। ত্বক তেল ছাড়ছে। শরীরে মেদের পলেস্তারা। কণ্ঠে গুনগুন গান,

ওই দেখা যায় বাড়ী আমার
চৌদিকে মালঞ্চের বেড়া
ভ্রমরেতে গুনগুন করে
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥
ভ্রমর ভ্রমরী সনে
আনন্দিত কুসুমবনে
আমার এই ফুলবাগানে
তিলেক' নয় বসন্ত ছাড়া॥

গাছ পাতা ঝরিয়ে রিক্ত কঙ্কালসার হয়; কিন্তু আবার ঝিনঝিন করে সবুজ পত্রোদগমে বছরের শুরুতেই নবীন হয়ে ওঠে। শীতের পর বসন্ত আসে। মানুষ কি অপরাধ করেছে। তার প্রবাহ শুধু একমুখী। শুধু চলেই যায়। ফিরে তো আসে না। সুখের মুহূর্তকে তো ফিরে ভোগ করা যায় না।

ট্রাম ছুটছে। শীতের কলকাতা দৌড়চ্ছে পাশে পাশে। পাঁচতারা হোটেল আলোর মালায় সেজে আছে। সিনেমা হাউসের মাথায় চুম্বনরত নায়ক-নায়িকা। পাশে মুখব্যাদন করে আছে ভিলেন। ফুটপাতে নরনারীর জমায়েত। সবই যেন ভেসে চলেছে

স্রোতের ফুলের মত। বোনার্জির সঙ্গে এক সময় এই চটুল জীবনের যোগ ছিল, আজ আর নেই।

মানুষে মানুষে সম্পর্ক? তার তো কোনও বাঁধন নেই। এক ধরনের চুক্তি। রক্তের সম্পর্কই থাকছে না তো অন্য সম্পর্ক। এমন কিছু ধরো যা পালায় না। জীবনকে এমন একটা জায়গায় নামাও, যার আর তল নেই। এমন কিছু পাও যা চাইতে হয় না, আপনি আসে। বাতাসের মত, আলোর মত, বৃষ্টিধারার মত। এমন কিছু পাও যার পর আর কোনও পাওনা থাকে না।

সেই এক সন্ন্যাসী বলেছিলেন, সব ছাড়োয়ে, সব পাওয়ে। বটতলায় বসে আছেন, যেন মহারাজের মহারাজ। পৃথিবী লুটিয়ে আছে পায়ের তলায়। বাতাস যেন চামর করছে। সংসার সে তো দুর্বলের আশ্রয়স্থল। ঠুনকো সম্পর্ক গড়ে মরীচিকা নিয়ে বেঁচে থাকা।

বড় দেরি হয়ে গেছে বোনার্জি সায়েব। বাকি জীবনটা শুধু ক্ষতস্থান চেটে কাটাতে হবে। 'যেখানে কেউই কারো নয়, এমন কি আপনিও আপনার নয়, তাকেই সংসার বলে।' বৎস! 'মানুষের নিজের বন্ধন নিজের হাতে, নিজের মুক্তিও নিজের হাতে। নিজেরা জেনেশুনে ক্ষয়ে বন্ধনে পড়ে ভুগে মরি।'

পৃথিবীর দুই মেরুর মত জীবনেরও দুই মেরু, ত্যাগ আর ভোগ। ভোগের পরেই দুর্ভোগ। ত্যাগের পরেই কি তৃপ্তি! সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, 'আপনার এই অনিন্দ্যকান্তির উৎস কি?'

'বৎস, আমার কোন চিন্তা নেই। মহাশূন্যে আমার বসবাস। আমার কাছে এমন কিছু নেই যা তস্করে অপহরণ করতে পারে। আমার কাছে এমন কোনও বৈভব নেই যা মাপা যায়। লাখোপতির ওপর কোটিপতি থাকে, কোটিপতির ওপর অর্বুদপতি। আমার কোনও চিন্তা নেই। সুখ নেই ফলে দুঃখও নেই। জগতে

শূন্যটিকে চেনাই হল, চেনার চেনা সার চেনা। সংখ্যা হল এক, তার পাশে বসিয়ে যাও শূন্য। এক শূন্যে দশ, দুই শূন্যে একশো, তিনে হাজার, পাঁচে লাখ। এইবার এককে মুছে দাও তখন শূন্যের হাহাকার। পৃথিবী যে একের পাশে শূন্যের খেলা। এক আছে তাই শূন্যের মূল্য। এক নেই, তো সবই মহাশূন্য।'

'এই দৃপ্তভঙ্গি আপনি কোথায় পেলেন?'

'আমি যে দাসের দাস নই বাবা। আমার যে কোনও প্রভু নেই। যে জগৎ বলে, হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে, নইলে নাড়ু কোথায় পাবে, আমি তো সেই কার্য-কারণের জগতে বাস করি না। আমার চোখে রাজাও নেই ভিখারিও নেই। সব সমান। আমি সিন্নি দেখে এগোই না, কোঁতকা দেখে পেছই না।'

'আমরা তাহলে কেন এইভাবে জালে জড়িয়ে পড়ে আজীবন গোবেড়েন খাই।'

'সংস্কার, প্রারব্ধ। সীতা কি জানতেন না সোনার হরিণ হয় না। রামচন্দ্রও কি জানতেন না। জানতেন। তবু ছুটেছিলেন সেই মায়ার পিছনে।'

'মহারাজ কি করলে কি হয়! আর কি কিছু করার আছে? না এই ভবরোগ দুরারোগ্য?'

'শোন হে ক্ষত-বিক্ষত সংসারী, তোমরা সব শুনেছ, একটা শব্দ কি শুনেছ, কৃপা! কার কৃপা? জানো কি তিনি কে? হুঁহুঁ, হুঁহুঁ করেই তো সারা জীবন গেল। একবার তুঁহুঁ, তুঁহুঁ করে দেখই না। হলেও তো হতে পারে। পেলেও তো পেতে পার। বিশ্বাস কাকে বলে জানো? তা হলে একটা কৃপার গল্প শোনো—দুটি পাখির গল্প। দুটো পাখি ডিম পেড়েছিল সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে। ডিম সেখানেই রেখে তারা খাদ্যের সন্ধানে বেরুল। ফিরে এসে দেখে, সেই ফাঁকে সমুদ্রের ঢেউ এসে ডিমদুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সমুদ্রের কাণ্ড দেখে পাখি দুটির ভীষণ রাগ হল। তারা

ঠিক করলে সমুদ্রের জল শুষে ফেলে ডিমদুটি ফিরিয়ে আনবে। যেমন সংকল্প তেমন কাজ। ঠোঁটে করে জল এনে বালির ওপর ফেলতে লাগল। দিনরাত একইভাবে এই কাজ চলল। সমুদ্রের দেবতা কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি করছ তোমরা?" পাখিদুটি বরুণদেবকে বলল, "সমুদ্র আমাদের ডিম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা আমাদের ডিমদুটো ফিরে পাবার জন্যে সমুদ্রকে শুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।" দেবতা বরুণ তাদের অধ্যবসায় আর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে ডিমদুটি ফিরিয়ে দিলেন। সুখ আর শান্তির জন্যে তুমি সংসার-সমুদ্র ছেঁচতে পারবে? পারবে সেই পথে চলতে যে পথে কোনও সঙ্গী নেই। আছে তোমার সেই মনের জোর?'

'আজ্ঞে না। যা নেই বলেই মনে হয়, তাকে বিশ্বাস করে সব ছাড়ি কেমনে? আমরা যেসব দুই আর দুয়ে চারের জগতের মানুষ। আমরা কৃপা বলতে বুঝি বড় মানুষের কৃপা। বুঝি ভাগ্যের কৃপা। বুঝি আইনের কৃপা। বুঝি প্রকৃতির কৃপা। তাঁর কৃপা? তিনি কে?

'তাহলে উত্তর দাও, স্ত্রীকে বিশ্বাস করে কি পেলে?'

'সন্তান।'

'সন্তানকে বিশ্বাস করে কি পেলে?'

'বেদনা।'

'বন্ধুকে বিশ্বাস করে কি পেলে?'

'ছলনা।'

'সুসময়কে বিশ্বাস করে কি পেলে?'

'দুঃসময়।'

'শরীরকে বিশ্বাস করে কি পেলে?'

'ব্যাধি।'

'তোমরা যাকে বিশ্বাস করো না তাঁকে বিশ্বাস করে আমি কি

পেয়েছি দ্যাখো। দুর্বলের সংসার। সবলের সন্ন্যাস। মন যখন হেলতে চায়, তখন তাকে শোনাই,

অহং দেবো না চান্যোঽহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন
শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত-স্ব ভাববান্॥
—আমি দেবতা, আমি অন্য কিছু নই, আমি
সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—কোনও শোক আমাকে স্পর্শ
করে না। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—
নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্। ওঁ তৎসৎ,
ওঁ তৎসৎ।'

১৩

কোথায় যাবে মা তুমি ? কার ঘরে, প্রবীণরা বলেন, মেয়ে হল পরের সম্পত্তি। খাইয়ে দাইয়ে, শিক্ষা দিয়ে, একদিন খাঁচা খুলে উড়িয়ে দাও। সেদিন এক প্রবীণ মানুষ কাগজ পেনসিল নিয়ে হিসেব করছিলেন। এ বাজারে একটি মেয়ে পার করতে, নমঃ নমঃ করে কত লাগতে পারে। কম করেও সোনা লাগবে দশ ভরি। একটি হার, দু'গাছা চুড়ি, একটি বাউটি অথবা তাবিজ, বোতাম এক সেট, দুটি আংটি ; সোনার ভরি দু'হাজার, ভরি প্রতি বানি দুশো টাকা, তার মানে বাইশ শো টাকা। এইতেই চলে গেল বাইশ হাজার। একটি খাট বিছানা সমেত চার থেকে পাঁচ হাজার। সাতাশে উঠল। এরপর ড্রেসিং-টেবিল, আলমারি, অন্যান্য সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার ধাক্কা।

বড় সাংঘাতিক কথা। সংসারে দুটি মেয়ে মানে একলাখ বিশ হাজার। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কোথায় পাবে এত টাকা। এখন তো সকলেই প্রায় শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত। মেলামেশারও বাধা নেই। প্রেমের ছড়াছড়ি। তবু এই আতঙ্ক কেন ? কন্যা-সন্তান জন্মালে পরিবারের মুখের হাসি মিলিয়ে যায় কেন ? নারী ছাড়া সংসার অচল। অথচ নারীকে সংসারস্থ করতে লাখোপতি হতে হবে কেন ?

হিসেব শেষ করে প্রবীণ মানুষটি করুণ মুখে তাকালেন। বললেন, 'জানাশোনা ঘর ছাড়া উটকো কারুর হাতে মেয়েটিকে তো তুলে দিতে পারব না। সে সাহস আর নেই।'

'কেন ?'

'দিন-কাল যা পড়েছে, খুব জানা ঘর না হলে মেয়ের জীবন

নিয়ে টানাটানি। মেরে হয়ত ঝুলিয়েই দিলে। বললে আত্মহত্যা করেছে।'

'মিছে ভাবছেন। শিক্ষিত ছেলেরা তা করবে কেন ?

'শিক্ষিত ?' ভদ্রলোক হাসলেন,' হালফিলের একটা ঘটনা তোমাকে বলি। ছেলে আর মেয়ে দুজনে ইঞ্জিনিয়ার। পড়তে পড়তে আলাপ। আলাপ থেকে প্রেম। প্রেম পাকল বিয়েতে। ছেলেটি চাকরি পেল বোম্বাইতে। বছর না ঘুরতেই শুরু হল মেয়েটির আর্তনাদ। ছেলেটি এক গুজরাতী রমণীর প্রেমে হাবুডুবু। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার, মারধোর।'

'সে কি ?'

হ্যাঁ বাবাজি। শিক্ষা কি করবে। শিক্ষার চেয়ে, প্রেমের চেয়ে, দেহ বড় জিনিস। এক প্রেম শুকিয়ে আর এক প্রেমের উদয়। মেয়েটি শেষে পালিয়ে এল কলকাতায়। ডিভোর্স হয়ে গেল। সাত বছর হয়ে গেল, সেই মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি। কে বিয়ে করবে একজন ডিভোর্সিকে। বিদ্যাসাগর তো বিধবা বিবাহের জন্যে অনেক লড়েছিলেন। হল কিছু ? বিধবা, বিধবাই রয়ে গেল। আমাদের সব আধুনিকতা মুখে। মনে সেই প্রাচীন সংস্কার। অতএব বুঝতেই' পারছ। পাত্র নির্বাচন, বিবাহ খুব সহজ নিরুদ্বেগ ব্যাপার নয়। জীবনে জীবন ধারন এমন এক জটিল প্ল্যাস্টিক সার্জারি, শেষ না হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায় না। দশ বছর ঘর সংসার করার পরও সংসার ভেঙে যেতে পারে।'

মেয়ের বিয়ে না দিলেই হয়। লেখা-পড়া শিখিয়ে সাবলম্বী করে ছেড়ে দাও। বলা সহজ। প্রস্তাবটি মোটেই বাস্তব-সম্মত নয়। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ জোহারে সুন্দর একটি উক্তি আছে। God creates new worlds constantly. In what way ? By causing marriages to take place. ঈশ্বর অনবরতই নতুন জগৎ কিভাবে সৃষ্টি করছেন ? বিবাহের দ্বারা। দুটি হাতে দুটি হাত

মিলিয়ে ছেড়ে দেন।

জোহার বলছেন, আত্মা যখন স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নামে, তখন একক অবস্থায় নামে না। নেমে আসে জোট বেঁধে, একটি পুরুষ আত্মা, একটি স্ত্রী আত্মা। পুরুষ গ্রহণ করে পুরুষের শরীর, নারী গ্রহণ করে রমণীর শরীর। এরপর ঈশ্বর নির্বাচিত পুরুষ আর নারীকে বিবাহ বন্ধনে বেঁধে দেন। এরই নাম পুনর্মিলন। পুণ্যাত্মা বিবাহিত পুরুষকেই আশ্রয় করে। কারণ অবিবাহিত পুরুষ কখনই সম্পূর্ণ মানবের স্বীকৃতি পায় না, অর্ধ সম্পূর্ণ। পুণ্যাত্মা অসমাপ্ত বস্তুতে আস্থা রাখে না।

সব দেশের শাস্ত্রই বিবাহকে পুণ্যবন্ধনের মর্যাদা দিয়েছেন। ম্যারেজ মেকস এ কমপ্লিট ম্যান—শুনে শুনে আমাদের কান পচে গেছে। অথচ বিবাহ এখন সবচেয়ে ভীতিপ্রদ ব্যাপার। কি হবে কোনও পক্ষেরই জানা নেই। প্রতিদিন সংবাদপত্র খোলা মাত্রই একাধিক বধূহত্যার খবর সভ্যতাকে স্তব্ধ করে দেবে। পুণ্যাত্মা যদি বিবাহিত ব্যক্তিকেই ভর করবে, তা হলে সে আত্মা কেন ছুরি ছোরা নিয়ে একটি নিরীহ রমণীকে জবাই করার জন্যে তেড়ে যায়! মানুষ এগোচ্ছে না পেছোচ্ছে! মানুষ ক্রমশই অতিমানুষ না হয়ে বনমানুষ হয়ে যাচ্ছে। রাম-রাজ্য দ্বিতীয়বার আর প্রতিষ্ঠিত হল না। শ্রীকৃষ্ণ সেই যে গেলেন আর এলেন না। মামেকং শরণং ব্রজ। কেউ শুনলে না। গৌতমবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হলেন না। সময় এইভাবেই আমাদের ছলনা করে আসছে। হীরক যুগ চলে গেল, ফিরে আর এল না। ঐতিহাসিকরা বৃথাই আশ্বাস দিলেন—হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেল্‌ফ। ফিরে ফিরে যুদ্ধ আসে, বন্যা আসে, দুর্ভিক্ষ আসে, মহামারী আসে, রাবণ আসে, রাম আর আসেন না। যুধিষ্ঠির সহ-ভ্রাতা সেই যে গেলেন আর নেমে এলেন না, এদিকে পাড়ায় পাড়ায় কুরুক্ষেত্র। পঞ্চপাণ্ডব কোণঠাসা। কৃষ্ণ কোথায়। কে হবেন রথের সারথি!

মেয়ে বড় হচ্ছে। বাপমায়ের প্রাণ শুকোচ্ছে। বাড়ির সামনে সিটি মেরে যাচ্ছে নবকুমার। ফ্রী-সেক্সের বাতাস বইছে। আমেরিকান কায়দায় মেয়ে বলছে আমার ডেট আছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ঝুলছে, পাঁচ মিনিটেই গর্ভমোচন। মনুর কথা বা বিধান এখন কথার কথা। ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ [জাবাল উপনিষৎ] প্রথমে ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ছাত্র। জীবনে দ্বিতীয় পর্বে গৃহী। তৃতীয় পর্বে বনী অর্থাৎ গৃহত্যাগ। চতুর্থ পর্বে সন্ন্যাস। ভারত এখন আর নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় না। জেট-এজে ঋষিরা সব বনমানুষ। রাজনীতি চটকানো শিক্ষা ব্যবস্থা আর কোনও দিন বলবে না, বৎস মানুষ হও, ইস্পাত কঠিন চরিত্র তৈরী করো। বলবে শিক্ষিত জন্তু হয়ে বৈভব উৎপাদন করো। বিবাহ মানে আত্মার মিলন নয়, সেক্স। বংশের, দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তানের সাধনা নয়, পরিবার পরিকল্পনার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা দুয়েকটি পেটের শত্রু। স্বেচ্ছায় বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস নয়, ঝেঁটিয়ে বিদায়। আধুনিকতা জিন্দাবাদ। কম্পিউটারের হাসি, কম্পিউটারের কাশি। জীবন হাড়মাসের যন্ত্র। গৃহ আর আশ্রম নয় আস্তাবল। নাও, বোঝো ঠ্যালা। বোম্বাইসে আয়া মেরা দোস্ত! হিন্দি সিনেমা জীবনের পাঠশালা। রঙ, ঢঙ, ভাষা, হাঁটাচলা সবেতেই পর্দার প্রভাব। রেডিও অষ্টপ্রহর কানে প্রেম আর বিরহের আরক ঢালছে। টিভির পর্দার নায়িকা নাচছে। ভাঁড়েদের তোতলামি, নায়ক আর ভিলেনের ফিফ্টি-ফাইট। সামনে এক সার পেঙ্গুইন-দর্শক। একটা ক্ল্যাসিক্যাল জাতের কি বিচিত্র উত্তরণ। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ থেকে বচ্চন, খান্না। এই পরিবেশে ঘরে অনূঢ়া মেয়ে রাখার ঝুঁকি কি কম!

বিধায়ক মনু সেই যুগেই সাহস করে বলতে পারেননি মেয়েকে ঘরে পুষে রাখো পাত্রের অভাবে। গৃহস্থের যৌন জীবনের প্রযোজনীয়তা তিনি বুঝতেন। জ্ঞানের কথা, যোগের কথা বলে

মানুষকে প্রবৃত্তি-মার্গ থেকে সহজে সরানো যাবে না। পরদারাসক্ত হয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার করে দেবে। মনু বললেন, ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা, কামিনী-কাঞ্চন একেবারে ত্যাগ, সংসারীর পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরে মন, প্রয়োজনে ওই সদারা সহবাস। মনুর বিধান, নারী নিজপতি-নিরতা থাকবে। কালেহদাতা পিতা বাচ্যো, বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ। যোগ্যকালে কন্যাকে পাত্রস্থা না করলে, পিতা আর ঋতুকালে পত্নীতে উপগত না হলে, পতি নিন্দার্হ। ইহুদী শাস্ত্রের নির্দেশ আরও সাংঘাতিক, বিবাহযোগ্যা কন্যার পাত্রসন্ধানে পিতা ব্যর্থ হলে, কৃত-দাসের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দাও। [If your daughter is connubile and you cannot find a husband for her, manumit your slave and marry her. মনু আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের শুচিতা নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। গৃহিণী না হলে গৃহ গৃহই নয়। ন গৃহং গৃহম্ ইত্যাহুর্গৃহিণী গৃহম উচ্যতে] কন্যা ঋতুমতী হবার তিন বছরের মধ্যে পিতা যদি তার বিবাহ না দেন, তবে মনুর বিধানে ওই কন্যা নিজের পতি নিজেই নির্বাচন করে নিতে পারবে। ব্যাভিচারের সাংঘাতিক শাস্তির বিধান তাঁর নির্দেশে আছে। স্ত্রী যদি পরপুরুষে আসক্তা হয়, তা হলে রাজা তাকে সর্বসমক্ষে কুকুর দিয়ে দংশন করাবেন। [ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা। তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ রাজা সংস্থানে বহু-সংস্থিতে]। আর পরস্ত্রীগামী পুরুষের বেলায়? রাজা তাকে অগ্নিতপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করিয়ে ঝলসে মারবেন। [পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে। অভ্যাদধ্যুশ্চে কাষ্ঠানি তত্র দাহ্যেত পাপকৃৎ]।

বাপ্‌রে, কি সাংঘাতিক বিধান? সমাজ সময়ের স্রোতে আজ কোথায় চলে এসেছে। জনৈকা আধুনিকাকে বলতে শুনেছি, 'আমি যে লোকটার সঙ্গে থাকি-না, সে সাড়ে সাতটার সময় অফিস থেকে

'ফেরে ভাই।' স্বামী হল লোক। বিবাহ হল থাকা। বিদেশী বাতাস জোর বইছে। সেখানে—The matrimonial instinct is lossing ground. Women refuse to be mothers. অতঃপর কি হবে? খুবই ভাবনার কথা। মানুষ তাহলে কোন মায়ের পেটে জন্মাবে? আমাদের পিতৃপরিচয় থাকবে তো! না জারজে পৃথিবী ভরে যাবে! না দশ মিনিটে গর্ভমোচনের দাওয়াইয়ে পৃথিবী জনশূন্য হয়ে যাবে! কি যে হবে অ্যাটম বোমাই জানে।

আমরা যারা সাবেক কালের পাঁঠা, মাঝে মাঝে তাদের মনে নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসে। সুস্থ একজন পিতা আর সুস্থ একজন মাতা দুয়ার খুলে কোল পেতে না দিলে আধুনিক কাল আসবে কি করে? আমরা তো স্বয়ম্ভু নই। কিছু একটা ভাঙলে কিছু একটা গড়তে তো হবে! সিটি মেরে, শাড়ির আঁচল টেনে যে আধুনিকতা প্রকাশ করছে, তারও তো একটা গর্ভের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রয়োজন হয়েছিল এক বিন্দু বীর্যের। তার মুখেও তো মা স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। মাঝরাতে ভিজে কাঁথা পাল্টেছিলেন। ছেলেকে বিয়ের পাল্লায় তোলার সময় পিতা কি তাঁর নিজের কন্যার কথা ভাবেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। পৃথিবী চিরকালই বোধশূন্য। মেয়ে বড় হয়। পিতামাতার নিদ্রা চলে যায়। প্রেমিক যুবকও পিঁড়েয় বসার আগে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। খাট? সেগুনের তো! ফ্রিজ? ইনবিল্ট স্টেবিলাইজার আছে তো! হাত ঘড়ি? ডে, ডেট, কোয়ার্জ তো! মেয়েটিকে তো আগেই যৎপরোনাস্তি বাজানো হয়েছে। তবু, তবু মধ্যরাতে ব্রিজের ওপর দিয়ে জ্বলন্ত উল্কা-পিণ্ডের মত একটি মেয়ে ছুটে চলেছে। আর্ত চিৎকার—বাঁচাও, বাঁচাও। পুরুষ-জাতির হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। হায় মনু! হায় জোহার!

১৪

আমার কেউ কোথাও নেই। একেবারে নিঃসঙ্গ। আমি আছি আর আমার সামনে বৈরী এক পৃথিবী। মুদীঅলার মত টাটে বসে আছে সামনে পাল্লা ঝুলিয়ে। মুখে লেখা আছে, 'ফেল কড়ি মাখো তেল, আমি কি তোমার পর।' আমার শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, তেমন কোনও বংশ পরিচয় নেই। এমন কোনও পুঁজি নেই যা আমি ভাঙিয়ে খেতে পারি। শুধু একটা শরীর আছে, আর সেই শরীরে আছে একটি মন। আছে আর পাঁচজনের মত বেঁচে থাকার ইচ্ছা। পা দুটো চলতে পারে। আমাকে চালাতে পারে। হাত দুটো ভাঙতে পারে, গড়তে পারে। সহজাত একটা বুদ্ধিবৃত্তি আছে, যা পড়ে শিখছে না, দেখে শিখছে।

এমন একটা অবস্থার কথা ভাবতেও ভয় লাগে। বুক কেঁপে ওঠে। আমি বেড়াল, কি কুকুর হলে এসব ভাবতুম না। নির্জন দুপুরে আমাদের গলিতে লম্বা, লম্বা ছায়া পড়েছে। শুকনো জলের কল। জল আসার আগেই সার সার রঙচটা প্ল্যাস্টিকের বালতির লাইন পড়ে গেছে। দু'হাত, তিনহাত অন্তর অন্তর ছাই আর আবর্জনার ঢিপি চড়া আলোয় ক্যাট ক্যাট করছে। হঠাৎ কোথা থেকে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে একটা কুকুর এসে ছাই ঢিবি শুঁকতে লাগল। দেখেই মনে হল বহু দিন তেমন আহারাদি হয়নি। শীর্ণ হয়ে গেছে। সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত। চোখে অদ্ভুত এক ভীত দৃষ্টি। হঠাৎ কোথা থেকে তেড়ে এল হোমদা হোমদা আরও গোটা দুই কুকুর। শুরু হয়ে গেল তর্জন গর্জন। সমবেত আক্রমণ। কামড়া কামড়ি। কুকুরটা ন্যাজ গুটিয়ে পালাল।

কুকুরের পৃথিবী আর মানুষের পৃথিবীতে বিশেষ তফাৎ নেই। প্রায় একই নিয়মে চলছে। কুকুরের ভাষা নেই, মানুষের ভাষা আছে। মানুষ বেরোও বলতে পারে। শুয়োরের বাচ্চা বলতে পারে। কোর্টে কেস ঠুকে মায়ের পেটের ভাইকে ভিটে ছাড়া করতে পারে। একজন আর একজনের পেছনে লেগে জীবিকাচ্যুত করতে পারে। কলের সামনে জলের লাইনে শক্তিমান ঠ্যাঙা হাতে এসে একজনের লাশ ফেলে নিজের বালতিটিকে শেষ থেকে প্রথমে আনতে পারে। এই নাকি 'রুলস অফ দি গেম।'

এক মানব আর মানবী কোনও এক শ্রাবণের রাতে জৈব নিয়মে শরীরে শরীর রেখেছিল। আর ঠিক দশটি মাসের ব্যবধানে কেঁদে উঠল আর এক মানব সন্তান। রাজারও ছেলে হয়, ভিখিরিরও হয়। কেউ ঠেকাতে পারে না। অসংখ্য যোনী জীব যন্ত্রণায় ছটফট করছে। জন্মের ওপর জাতকের নিজস্ব কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই। কে কোথায় এসে পড়ব একেবারেই অজানা। আমাদের শৈশব বড় অনিশ্চিত। নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কত কী ঘটে যেতে পারে। সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মালেও ভাগ্যকে মানতেই হয়। যে সংসারে জন্মেছি বড় লোকের খেয়ালে সে সংসার ভেঙে যেতে পারে। জমিদার কি শিল্পপতি পিতা, মদ আর মেয়ে মানুষের পেছনে সব উড়িয়ে দিলেন। উত্তরপুরুষের জন্যে নীলরক্তের অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই রইল না। শৈশব চলে গেল অবহেলায়। যৌবন জীবনের সঙ্গে লড়াইয়ের কোনও প্রস্তুতি দিয়ে গেল না। প্রৌঢ় তখন সংসারের পথে সারমেয়র মত। পিতার নামটি গলায় তখমা হয়ে ঝুলছে। কারু করুণা নয়, ঘৃণাই তখন জীবনের সম্বল। হতাশাই তখন ভূষণ। মধ্যাহ্নেই আঁধার ঘনিয়ে এল। বীরভোগ্যা পৃথিবীর যাবতীয় আয়োজনের মাঝে শুষ্ক, শীর্ণ, পত্রবিরল একটি বৃক্ষের ডালপালায় নীল আকাশ অতি ধূসর। পাখি আসে না। পায়ের তলায় পথিকের জন্যে ছায়া পড়ে থাকে

না। বর্ষার সঞ্চিত জলধারা তুলে নিতে পারে না। অপ্রস্তুত শিকড়।

এমনও হতে পারত মাতা তার অবাঞ্ছিত শিশুটিকে আবর্জনায় নিক্ষেপ করে মাতৃত্বের দায় মুক্ত হলেন। ক্রন্দনই যার পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণের এক মাত্র ক্ষমতা, সে হয়ত সেই কান্না দিয়েই একটি প্রাণের উপস্থিতির কথা জানাল কোনও দয়ালুর কাছে, আবর্জনা থেকে উঠল গিয়ে দোলায়। এমন আর কটি পরিত্যক্ত শিশুর বরাতে ঘটে। অন্ধকার এলাকার পরিসর অনেক বেশি। অন্ধকারের নায়করা আলোর সেনাপতিদের অতি সহজেই কিনতে পারে। সংসার-স্নেহে যারা সুরক্ষিত তারাও তো ছিটকে বেরিয়ে যায়! আর যারা একেবারেই অসহায় অপরাধ জগতের অক্টোপাশ তাদের তো ধরবেই। অমৃতের পুত্র গরল-পুত্র হয়ে মানুষের সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিতে চায়।

পৃথিবী বড় অনিশ্চিত স্থান। আকস্মিকতায় ভরা। কার ভাগ্যে কখন কী ঘটে যাবে কিছুই জানা নেই। উত্তরপুরুষ পূর্ব-পুরুষের অবস্থার দিকে তাকিয়ে কোনও দিনই বলতে পারবে না, তুমি নিজেই পরাজিত, কৃতদাসের সংখ্যা, পথের পাশে পড়ে থাকা ভিখিরির সংখ্যা আর না-ই বা বাড়ালে। পৃথিবীর ভাগ বাঁটোয়ারা বহু বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। রাজা থেকে রাজা বেরোবে। প্রজা থেকে প্রজা। ভূস্বামীর বীজ থেকে অঙ্কুরিত হবে আর এক ভূস্বামী। দিনমজুর সংখ্যায় বেড়ে দিনমজুরই হবে। দার্শনিক অথবা সমাজ সংস্কারকের হাতে কিছু নেই। অক্ষরের মালা গেঁথে পৃথিবীর পুরনো চেহারা পাল্টান যাবে না। অসিমুখে পৃথিবী ফালাফালা হয়ে গেছে। পাট্টা আর পত্তনি নিয়ে যে যেখানে ঘাঁটি আগলে বসে আছে, সে সেখানেই বসে থাকবে পুরুষানুক্রমে। বিনা রণে সূচ্যগ্র স্বার্থ কেউ ছাড়বে না। তুমি কিছু চাও! এক খণ্ড রুটি তোমার মুখের সামনে ছুঁড়ে দিতে পারি দয়ার দান। কিন্তু

খানার টেবিলটি আমার। কে বলে এটা মানুষের পৃথিবী! পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদকে মানুষের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল বেরোবে তা প্রতিটি মানুষের ভাগ্যফল হতে পারে না। প্রশ্ন কোরো না, কে তোমাকে ঐশ্বর্যের অধিকার দিয়েছে! ঈশ্বর! না। ইতিহাস।

অধিকার থেকে গড়িয়ে চলেছে উত্তরাধিকারের স্রোতধারা। ইতিহাস হল অধিকারের ইতিহাস। অধিকার হারাবার ইতিহাস। শোণিতের ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে ভয়। তক্তে বসিয়ে যাই উত্তর-পুরুষকে। জীবনভর তারই প্রস্তুতি। আমি অধিকার করেছি। তুমিও অধিকার কর। আমার অধিকার মানে তোমার বঞ্চনা। ইতিহাসের দুটি ধারা—অধিকারের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস। তোমার প্রতি আমার যত দয়া আর করুণা সবই হল অধিকারীর অহঙ্কার। পৃথিবীর দুটি মাত্র খেতাব হওয়া উচিত, অধিকারী আর অনধিকারী। উইলসন, নেলসন, রকিফেলার, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বোস, মিত্তির নয়।

অনধিকারীরা আছে বলেই, অধিকারীদের এত বিলাস। চায়ের দোকানের বয়, গৃহের গৃহভৃত্য। আমার সম্পদ ঠাসা সুদৃশ্য ব্যাগ তোমার মাথায়। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া আমার পুত্রের হাত তোমার হাতে। আমার মোজাইক করা মেঝেতে তোমার হাতের ন্যাতার দু'বেলা ঘর্ষণ। আমার স্ত্রীর ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রূপচর্চা তোমারই শ্রমের দান। আমার সন্তুষ্টিই তোমার বেঁচে থাকার প্রাণরস। আমার অতীত ছিল বলেই বর্তমান আছে। বর্তমান আছে বলেই ভবিষ্যৎ তৈরী হচ্ছে। তোমার বর্তমান নেই ভবিষ্যৎও নেই। আমার সামনে পথ তোমার সামনে দেয়াল।

যুগে যুগে অনেকেই এলেন, পৃথিবীর আদি বিলি ব্যবস্থা কিন্তু বদলানো গেল না। এখানে নয়, কোথাও নয়। কত ইজম এলো

আর গেল। ছাপাখানা কোটি কোটি অক্ষর প্রসব করে গেল। লক্ষ লক্ষ কথামালা ইথার তরঙ্গে ভেসে গেল। হল না কিছুই।

আকাশছোঁয়া ইমারত উঠে গেল আকাশের দিকে। ফোর্ড থেকে ডাটসন। ভল্ল আর বর্ম থেকে মিরাজ, ফ্যান্টম, আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র। বিদেশী শোষকের বদলে স্বদেশী শোষক! টিবির বদলে ক্যানসার। কলেরার বদলে জনডিস। অনাহার নাম পাল্টে সভ্য ম্যাল-নিউট্রিসান।

লাখ লাখ পি এইচ ডি, ডি লিট তবু বধূর গায়ে কেরোসিন, গলায় শাড়ি। নাটকে বিস্ফোরণ, যাত্রায় রণহুঙ্কার, সংগীত সমুদ্রের দোলা, গণ নৃত্য, গণ মিছিল আবার গণধর্ষণ। টাই আঁটা সেমিনার ফাইলবাঁধা রিপোর্ট। সাপের সেই একই সর্পিল চলন, লাঠির সেই একই উদ্যত ভঙ্গি। কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। দুধেতে কদলি দলি/তাহাতে আমসত্ত্ব ফেলি/হাপুস হুপুস/পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে। অধিকারীর জগতে অধিকারীর আইনই সাব্যস্ত। অনধি-কারীদের শুধু মেনে নেওয়া আর মানানো। পৃথিবী এক অদ্ভুত স্থান।

এই সবুজ শ্যামল ভূখণ্ড
আর অগাধ জলরাশি,
অথবা ধু ধু মরু
আর শিলা সারি সারি
চঞ্চল আলোকিত জনপদ
অন্ধকার গ্রাম আর নিবিড় বনানী
আমরা সবাই জানি।
পর্যটক ঘুরে ঘুরে সবই দেখেছে।
পৃথিবীতে আর কোনো স্থান নেই
যেখানে কলম্বাস দিতে পারে পাড়ি।
এইবার!

আর এক পৃথিবীর খবর
আমি দিতে পারি
এই গোলকেরই আদলে
কায়ার পাশে ছায়ার মত
মহাশূন্যে ভাসছে।
এই পৃথিবীরই এক ছায়া ছায়া
বিষণ্ণ বীভৎস রূপ
সেখানে হায়নারা ধরেছে
মানুষের কায়া
তস্কর পরেছে সাধুর বেশ,
জননী ডাকিনী সেজে
সন্তানের শোণিতে করে
তৃষ্ণা নিবারণ।
সে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল
দূষিত বাষ্পে ভরা
সেখানে চুম্বন শুধু
মৃত্যুর নিশানা।
আমি সেই নভোচর
মহাশূন্যে নভোযান থেকে
রাতে,
দেখেছি সেই ছায়া ছায়া
বিষাক্ত দ্বিপদে ভরা
ধূমায়িত আর এক পৃথিবী ঃ

১৫

মনে মনে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ঠেলছি। ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছি। আমার পথ থেকে তুমি সরে যাও। প্রয়োজনে আমাদের এক চেহারা। মুখে মিষ্টি সম্বোধন। ভাই বলে কাঁধে হাত। বাড়িতে এলে সব্যস্ত চিৎকার, ওরে চা চাপা চা। পাঁপড় ভাজ মুচমুচে করে। ফুলকো লুচি, কড়কড়িয়া আলুভাজা। প্রয়োজন যেই ফুরিয়ে গেল কেউ কাউকে চিনি না। প্রাচীন প্রবাদ আজও সমান সত্য কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি।

যার ভুতের ভয় সে বাইরে গেলে মানুষ খোঁজে। আয় ভাই তোরা যে যেখানে আছিস আমাকে ঘিরে বোস। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালেই গা ছমছম করছে। একা যে আমি শুতে পারি না। ভয়ে ঘুম আসে না। তোমরা যে কেউ একজন আমার পাশে শোও। যেই ভোর হল, দিনের আলো ফুটলো, গেট আউট, বেরোও।

বাইরে বেড়াতে যাবো। বড় একা। দিনকাল সুবিধের নয়। চলো হে, আমার সঙ্গে চলো। বায়ু পরিবর্তন হবে। বন্ধু আমার। আমি বেশ গোছগাছ করে ট্রেনের জানলার ধারে বসি। তুমি মালপত্তর তুলে বাঙ্কে গুছিয়ে রাখো। ভড়াটাড়া মেটাও। স্টেশানে স্টেশানে চা ধরো। মাঝে মধ্যে ভালো ভালো খাবারদাবার। তুমি আমার ম্যানেজার। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। তাই তো সদলে চলেছি বায়ু পরিবর্তনে। চোর-ডাকাতের ভয় আছে। প্রাদেশিকতার সমস্যা আছে। সেই কারণে বিদেশে লোকবলের প্রয়োজন আছে। এই যে আঁতাত, এ কিন্তু চিরকালের নয়। সে ভুল কোরো না। উঁচু পদে চাকরি করি বলে, ফিরে এসেই ছেলের

চাকরির কথা যেন বোলো না। ও আমার দ্বারা হবে না। তখন আবার অন্য প্রদেশের মানুষের চরিত্র তুলে আমার চরিত্র খাটো করার চেষ্টা কোরো না। তাদের একজনও কেউ কোথায় ঢুকলেই হল। দেশোয়ালী ভাইয়ে দপ্তর ছেয়ে যায়, ও সব সেণ্টিমেণ্টাল কথা বলে, আমাকে নীতিভ্রষ্ট করার চেষ্টা কোরো না। আমি বাঙালী। আমি আমার ছাড়া কারুর নই। একমাত্র আমার সন্তানের জন্যে, আমার পরিবারের জন্যে, আমি কিছু করতে পারি। তোমরাও তাই করো না। কে বারণ করেছে। মুরুব্বি ধরা এক ধরনের অপরাধ। বাঙালী নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো। সেল্‌ফ-মেড হও। শুধু আমার দাঁড়াবার সময় তোমার পদযুগল আমাকে ধার দিও।

আমাকে ধান্দাবাজ বলাটা মনে হয় ঠিক হবে না। আমি বিশ্বাস করি সুযোগ মানুষের জীবনে একবারই আসে। মাছের মত। কপাত করে এক চেষ্টায় ধরতে না পারলে পিছলে পালিয়ে যাবে অন্যের এলাকায়। পলাতক ভাগ্য, পলাতক যৌবন, কে না ধরে রাখতে চায়। আমি মধ্যবিত্ত, ইংরেজের তৈরি। অন্যের কাঁধে চড়ে পূর্ব-পুরুষদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। কি ভীষণ হম্বিতম্বি। তাকেই নাকি বলা হত বাঘের মত ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা গোটা কতক চোতা হাতে এলেই মহাপণ্ডিত। কথায় ইংরেজির ফুলকি। অহমিকায় চোখমুখ বিকৃত। বিলেত গেলে তো কথাই ছিল না। সে সবই এখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের আর সে দাম নেই। কেতাবের চেয়ে জীবন যে অনেক বেশি মূল্যবান সেই সত্যটি ঝুলি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার লম্ফ মারছেন, আমিই সব। মিস্ত্রী মুচকি হাসছেন, জনাব এগিয়ে এসো না, দেখি কেমন রড বাঁধতে পারো। ফিজিক্‌সের বাঘ হন্যে হয়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী খুঁজছেন। মিচিগান থেকে বাড়তি ন্যাজ এনেছেন। আমেরিকান অধ্যাপক বন্ধু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—ব্যাপারটা কি? তুমি এত বিচলিত কেন ইন্দু?

পাখা ঘুরছে না সাহেব। চেয়ারে উঠে কলকব্জা নেড়ে ঘুরিয়ে দাও। তুমি তো পদার্থবিজ্ঞানী। ওটা মিস্ত্রীর কাজ সায়েব। আমি থিয়োরি জানি। পাখা কেমন করে ঘোরে, সাত পাতার থিসিস লিখে দিতে পারি, কিন্তু পাখা খুলে মেরামত জীবনে করিনি। নেভার ইন মাই লাইফ। পূর্বপুরুষে এই ধারাই চলে আসছে। মানুষ দু খোপে ঢুকে আছে, একদলের সাদা কলার, হোয়াইট কলারড, আর এক দল ওই কুলিকামারি, চাষাবাসা, হেটো মেঠো। মেমসাহেব নাকি সুরে বলেন, ফিলদি, সায়েব হেঁড়ে গলায় বলেন, স্কাম অফ দি আর্থ। ব্যাটারা কোনও দিন মানুষ হবে না। বুঝলে এডুকেশান ছাড়া কোনও জাত এগোতে পারে না। সেণ্ট-পারসেণ্ট এডুকেশান চাই।

সায়েব চোখ কপালে তুলে, চিবুক উঁচিয়ে, হাত পা নেড়ে থিয়েটারের ভঙ্গিতে বললেন, এডুকেশান মেকস এ ম্যান। লুক অ্যাট জুপ্যান, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ইউ কে, ইউ এস এ, ইউ এস এস আর।

এই নাটকীয় আত্মবমনের পর শিশুপুত্রের দিকে নজর পড়ে যেতেই চিৎকার করে উঠলেন, ওপাশের জানালাটা খুলেছিস কেন র‍্যাশকেল। বন্ধ কর। বন্ধ কর। ওই আমতলার বস্তি ছেলে-মেয়েদের আর মানুষ হতে দেবে না দেখছি। নুইসেন্স অ্যাণ্ড ভালগার। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দাও।

ভদ্রলোক জিনিসটা কি?

এ গুড পেরেণ্টেজ। ভালো পিতামাতার সন্তান। এ গুড বংশ পরিচয়।

ভালো পিতামাতা মানে?

মানে রেসপেকটেবল। মাননীয়। সভায় বসলে বক্তা ভাষণ দিতে উঠে যাঁকে বলেন, মাননীয় সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি।

মানুষ মাননীয় হয় কি ভাবে?

বেশ পুঁজিপাটা থাকা চাই। রেস্তোর জোর। বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, হাঁক-ডাক, স্তাবক, উমেদার। অক্ষর জ্ঞান থাকলে তো কথাই নেই। একে শিক্ষিত, তায় বড়লোক। যেন গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। সেকালে শিক্ষার চেয়ে বাহুবল আর ধনবলেই মানুষ মানুষ হত। চিঠি আসত, মাননীয় অমুক, তলায় বিনয়াবনতের দল। একালের বাঙালীর ধন কোথায়? সবই তো ঠনঠনিয়া, ঢনঢনিয়াদের হাতে চলে গেছে। পূর্বপুরুষের ভিটেয় কোথাও ভাঙা গাড়ি মেরামতির কারখানা, কোথাও জয় মা কালী চোলাই-খানা, কোথাও বহুতল বাড়ির পাদপীঠ, স্কাই স্ক্র্যাপার, মেঘালয়, নীলকমল, জলকমল, স্থলকমল! একালের রিয়েল ভদ্দরলোক সেইরকম কোনও খুপরিতে বসবাস করেন। একেশ্বববাদী। বসের ভজন, বসামৃত পান। গণেশের পূজারী হলে, আমলাদের পীঠ-স্থানে হত্যা প্রদান। নেতার ভজনা। চামচা সেবা।

তোমরা দূরেই থাকো। শুধু রাতের অন্ধকারে ওয়াগন ভেঙে আমার গুদাম ভরে দাও, পার্কের রেলিং খুলে এনে আমার ঢালাই কারখানায় ফেল। আমি ব্ল্যাকে হোয়াইটে টুপাইস কামিয়ে আরও ওপরে উঠি মেঘলোকের কাছাকাছি। প্রায় বিমান। নীল আকাশ পরিষ্কার বাতাস। তোমরা আমার জন্যে পথের মিছিলে ঘোরো। আমার আসন পাকা হোক। আমার স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে ভিয়েনা পাঠাই, ছেলেকে সায়েব করার জন্যে ডাওহিলে। তোমরা স্লোগান তোলো। বিনা চিকিৎসায় মরো। তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের তুলে দাও সমাজবিরোধীদের হাতে। সমাজবিরোধী সমাজের বিরোধী হলেও আমাদের বিরোধী নয়।

ভালো মানুষ, ভালো মানেই বোকা মানুষ। তাঁরা সব ঠ্যালা খেয়ে সরে গেছেন। কোথায় তাঁরা! নির্জন প্রবাসে। সংসারে থাকলে একঘরে। অফিসে থাকলে ইউনিয়ানের বাইরে। সংসারের বাইরে থাকলে, হয় কোন আশ্রমে, অথবা কোনও তীর্থে। সংসার দুলছে

ঝড়ের খেয়ার মত। ভাই ভাইকে বলছে, তুই আমার নাম্বার ওয়ান এনিমি। স্বামী স্ত্রীর পদসেবী। দেখো নারী বড় প্রলোভন। সরে পোড়ো না। কি আশায় বাঁধি খেলাঘর। নেতা চেল্লাচ্ছেন—বিপ্লব, বিপ্লব।

ধ্যাত্তেরিকা সংসার। সবাই বললে, মানুষকে বিশ্বাস কোরো। বিশ্বাস করে কি পাওয়া গেল, বিশ্বযুদ্ধ, অসম, বিষম, অর্থনীতি। ঝোলটানার দল, ঝোলছাড়ার দল। পাওয়া গেল গলাবাজি, দলবাজি। পাওয়া গেল অবিশ্বাসী নেতা, অত্যাচারী মাস্তান, মানুষ মারা মাফিয়া। পাওয়া গেল সংবিধানহীন সংবিধান।

ধ্যাত্তেরিকা সংসার। বসে আছি একপাশে। খঞ্জনি হাতে। নাম গাই তাঁর। যিনি মানুষের চির বিশ্বাসে আছেন। যাঁকে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াতেই সুখ।

১৬

গোটা দুয়েক ঋতু বড় লাজুক হয়ে পড়েছে। দর্শক সচেতন অভিনেতার মত। মঞ্চের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারে। অবশেষে প্রয়োগকর্তার ধাক্কা খেয়ে মঞ্চে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অস্পষ্ট কয়েকটি সংলাপ বলে ছুটে পালায়। কোথায় হেমন্ত! কোথায় বসন্ত! দক্ষিণ দুয়ার সামান্য উন্মোচিত হয়। মন কেমন করা বাতাস ছুটে আসে। সতর্ক প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ দুয়ার টেনে দেন। বড় সাবধানী। বসন্ত আমাদের জীবন ছুঁয়ে যাক্, এ যেন তাঁর ইচ্ছা নয়। আমরা গ্রীষ্মে দগ্ধ হব। বর্ষায় তালগোল পাকাবো। সুখ আমাদের সহ্য হবে না।

এক সময় বসন্ত ছিল। ছিল আমাদের ছাত্রজীবনে। মনে ছিল, না বাইরে ছিল ভেবে দেখতে হয়। মনেই না-কি মথুরা! বয়েসেই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত! মনে যদি ফুল না ফোটে, উদ্যান-ভরা ফুলে কি করবে! মনে যদি কোকিল না ডাকে, গাছের কোকিলে কি হবে! মাইণ্ড ইন ইটস ওন প্লেস কেন মেক এ হেল অফ হেভন অ্যাণ্ড হেভন অফ হেল।

সেদিন এক নিউট্রিসানিস্টের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এখন না-কি দু'ধরনের ম্যাল-নিউট্রিসান দেখা যাচ্ছে। গরিবের অপুষ্টি আর ধনীর অপুষ্টি। কারুর জুটছে না, আর কারুর এত জুটছে যে জীবনে অরুচি ধরে যাচ্ছে। ইয়া বড় এক তালশাঁস সন্দেশ নিয়ে মা ছুটছেন আদুরে ছেলের পেছন, পেছন। খেয়ে যা বাবা, খেয়ে যা বাবা। ছেলে নাকে কেঁদে বলছে আমার আর ভালো লাগে না। ফেলে দাও নর্দমায়। ছেলের ইস্কুলে গিয়ে মা দেখলেন, একটি ছেলে ভারি হৃষ্টপুষ্ট, তেল চুকচুকে। অমনি শুরু হল

নিজের ছেলেকে তিরস্কার। কেন তুই অমন হতে পারিস না। ডিম, ছানা, দুধ, মাংস, ভিটামিনের আক্রমণ শুরু হল। ছেলে ভাবছে এর চেয়ে উপবাস ভালো ছিল। মার্ক টোয়েনের প্রিন্স অ্যাণ্ড পপারের মত।

বাড়ি একেবারে ফেটে যাচেচ। কী ব্যাপার! রোজ মুরগীর ঠ্যাং চিবিয়ে চিবিয়ে পরিবারস্থ সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ছানা নিয়ে দক্ষযজ্ঞ। মেয়ে বলছে, যম এত লোককে নেয় আমায় নেয় না কেন! ছেলে খাটের তলায় সেঁদিয়ে বসে আছে। ধরতে গেলেই থাবা মারছে। মা চিৎকার করে কর্তাকে বলছেন, পুলিসে খবর দাও, টিয়ারগ্যাস চার্জ করে বের করে আনুক শয়তানটাকে।

কর্তা বলছেন, আগে মশামারা ধূপ দিয়ে ট্রাই করো। ফেল করলে লঙ্কাপোড়া ধোঁয়া দাও! ওদিকে বাইরের ফুটপাথে? কর্পোরেশনের রেলিঙে বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা রুটি শুকোচ্ছে। আজ চলবে, কাল চলবে। বাজারের পাশ থেকে কুড়িয়ে আনা পচা শাকসব্জি ফুটপাথের নর্দমার ধারে ফেলে মরচে-ধরা একখণ্ড লোহা দিয়ে তরিবাদি করে কোটাকাটা হচ্ছে, যেন চীনে রেস্তোরাঁয় এখুনি ভেজিটেব্‌ল চৌ চৌ বসবে। ভাঙা হাঁড়িতে জল ফুটছে। পাশে বসে আগুনে ভাঙা প্যাকিং বাকসের টুকরো ঠেলছে বাঙলার বধূ, বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা।

বসন্ত আর লজ্জায় আসে না। কী হবে এসে। কোথায় উদ্যান! কোয়েলা কোথায়! কোথায় সূক্ষ্ম উত্তরীয়ধারী, দীর্ঘ কেশ কবি! কোথায় যৌবন মদালসা নায়িকা! বসন্ত আসবে কোথায়? মনুমেণ্টের তলায়, যার তলদেশ থেকে উৎসারিত সমস্ত রাজনৈতিক বাণী এখন স্তূপাকার আবর্জনা। বড় সুন্দর প্রতীকী দৃশ্য। কিছু শূকর শাবক ছেড়ে দিলেই সম্পূর্ণ একটি পরিকল্পনা। এই পঙ্ক থেকেই রাজনীতির পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে দিকে দিকে শোভিত। চামচা-ভ্রমবের দল ভনভন করছে। আর বিরহীর দল

বলছে : কোয়েলিয়া গান থামা এবার/তোর ওই কুহ্ তান/ভালো লাগে না আর।

বৃদ্ধরা যেমন বলেন, সে একটা সময় ছিল, যখন ঘিয়ে ঘি ছিল, তেলে তেল ছিল, মানুষে মানুষ ছিল। ঋতুতে ঋতু ছিল। আমিও বলি, আমাদের যৌবনে বসন্ত ছিল। সন্ধের দিকে রাস্তাঘাট বসন্তের বাতাসে কেমন যেন ভিজে ভিজে হয়ে উঠত। মাতাল বাতাস দুলে উঠত বারান্দা থেকে ঝোলানো চিত্রবিচিত্র শাড়িতে। লোড-শেডিংয়ের কোনও আতঙ্ক ছিল না। ঘরে ঘরে আলো, হাসির ফোয়ারা। কুলফি মালাই হেঁকে যেত পাড়ায় পাড়ায়। প্যাঁচার ঘুঘনি আসত আর একটু বেশি রাতে। রকে রকে জমাট আড্ডা। এরই মাঝে প্রজাপতি উড়িয়ে, গোড়ের মালা গলায়, বর চলে যেত চোখের সামনে দিয়ে হুস করে। দূর থেকে ভেসে আসত সানাইয়ের প্যাঁচানো সুর। গহনার দোকানের দেয়ালজোড়া আয়নায় আয়নায় আলোর লাখ লাখ চোখে লোভ ঝলসাতো। ফাগুন এসেছে, ফাগুন। আগুন আসছে পিছু পিছু। ফিন ফিনে পাঞ্জাবি উড়িয়ে বিক্রেতা ক্রেতাকে জড়োয়ার সেট দেখাচ্ছেন। ওদিকে বহুদূরে তাজমহলের মাথাব ওপর চাঁদ উঠছে। আগ্রা ফোর্টে বসে আছে সাজাহানের প্রেতাত্মা। সেনেট হলের থামের মাথায় মাথায়-বিনিদ্র পায়রার দল বুকের কষ্টে কোঁত পাড়ছে। গোটা তিনেক ভালো সরবতের দোকান ছিল। চটে বরফ পুরে কাঠের মুগুরের ঠ্যাঙানি। ভেতরে জমাট জলের কুঁচি কুঁচি হবার কান্না। গেলাসে গেলাসে সাদাঘোল গোলাপী সিরাপের নেশা। আরকের গন্ধ ছুটছে, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি গ্রীন ম্যাঙ্গো, পাইনঅ্যাপল। প্রেমসমুদ্রে বরফ যেন হাবুডুবু। বিয়ে বাড়ির গুরুভোজনে বরযাত্রী হাঁসফাঁস। পানবিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চুনোটকরা ধুতি পেছনে পেখম মেলে আছে। মিহি পাঞ্জাবির তলায় গেঞ্জির আভাস। সোডা লেমনেড চেয়েছেন। বোতলের মুখে যন্ত্র রেখে দোকানদার ঘা মারছেন।

গলার গুলি সশব্দে তলিয়ে যাবার আগে বোতলের মুখে বায়বীয় জলের গ্যাঁজলা। হাত বাড়িয়ে সিক্ত বোতল নিতে নিতে ক্রেতা আয়নায় নিজের মুখ দেখছেন। বন্ধুর শ্যালিকাটি মনে বড় দোলা দিয়েছে। পানের খিলি নেবার সময় হাতে হাত ঠেকেছে।

ওস্তাদ আসর ফেলেছেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের হলে। পরজ বসন্তে আলাপ চলেছে। সমঝদার বলছেন একেবারে স্পেল-বাউণ্ড করে দিলে হে। কি সুর! তিন সপ্তকে সহজ আনাগোনা। দুদিকে দুই বিশাল তানপুরা ম্যাও ম্যাও করে সুর ছাড়ছে। ওস্তাদজী মাঝে মাঝে সুরমণ্ডলে আঙুল টানছেন। সপ্তসুর ঝিলিক মেরে উঠছে। কর্মকর্তারা বুকে ব্যাজ এঁটে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরছেন। কারুর কারুর কাঁধে এখনও শাল। বড় সাবধানী। দখিনা বাতাস মৌজের সঙ্গে বসন্তও ছড়ায়। সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। গাড়ি এসে দাঁড়াল যন্ত্রপাতি নিয়ে নামছেন বেগম আখতার। রাত দুটোয় বসবেন বড়ে গোলাম আলি। লম্বা লিস্ট। সারারাত চলবে মাইফেল। শ্রোতারা ভাঁড়ের চা খেয়ে ঘুম তাড়াচ্ছেন। সারেঙ্গি ওদিকে সুরের মোচড় মারছে। মাঝে-মাঝেই রহিশ আদমিদের গাড়ি আসছে। সরব অভ্যর্থনা, আসুন আসুন। বোতল গেলাসে ঢালছে রঙিন মদিরা। রক্তস্রোতের মত মৃদু কুলু কুলু শব্দ। ওস্তাদজী ঠুংরির মুখ ধরেছেন, মুসে তো কুছু বোল।

মির্জাপুরের তেলেভাজার দোকানে হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো হচ্ছে, ঢাউস, ঢাউস, ঢন ঢন। ফাঁকা স্ট্রাণ্ড রোডে একটি মাত্র ছ্যাকরাগাড়ি ছিড়িক ছিড়িক শব্দে চলেছে। চিৎপুরে কাবাবের দোকানে বিশাল হাঁড়ি কাত হয়ে আছে। তলায় ধিকি ধিকি করছে কাঠকয়লার আগুন। তাওয়ায় রোগনজুস চর্বির মধ্যে পিটির পিটির করছে। কেওড়া, জায়ফল, জাফরানের গন্ধ উড়ছে বসন্তের বাতাসে। দোকানে ঠাসা খদ্দের। নাখোদার তলায় সার সার

দোকানে আতরের পলকাটা শিশি আলোয় চিক চিক করছে। কাঠির আগায় জড়ানো তুলোর কুঁড়ি সার সার ফুটে আছে।

নিস্তব্ধ অফিসপাড়া। বিশাল বিশাল বাড়ির তলায় নিষ্পন্দ রাস্তা পড়ে আছে চওড়া ফিতের মত। বাতাস লেগেছে ছেঁড়া শালপাতার ঠোঙায়। বিহারীরা ঢোল পেটাচ্ছে আর তারস্বরে হোলির গান গাইছে, রামা হো শ্যামা হো। বসন্তের রাত যত বাড়ছে, মানুষের ফুর্তি তত বাড়ছে। দেশে তখন এত ঘাতক ছিল না। রাত ছিল শান্তির। পাড়ায় পাড়ায় বোমবাজি ছিল না। বোমারুরা হয়তো ছিল ভ্রূণের আকারে ভবিষ্যতের গর্ভে। দশভরি সোনার গহনা পরে সুন্দরী মাঝরাতে পান চিবোতে চিবোতে ঘরে ফিরছেন নিঃশঙ্ক। বসন্তের মত আইন-শৃঙ্খলাও তখন অদৃশ্য হয়ে যায়নি। শীতের ধোঁয়াশা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বাতাস। ঝনঝনে রাত। তারার খই ফুটছে আকাশে। বাংলার ছড়ানো প্রান্তর পড়ে আছে নিচে। অযোধ্যাপাহাড়ের দিক থেকে রাস্তা বাঁক নিয়েছে, যেদিকে বাঘমুণ্ডি সেদিকে। রাস্তা নামতে নামতে শুয়ে পড়েছে মজানদীর বুকে। ভিজে বালিতে পা দেবে যাচ্ছে। চারপাশের বনস্থলিতে বসন্তের বাহার লেগেছে। আসছে পলাশ লাল ডানা মেলে। সুপ্ত পৃথিবী। পাহাড় ধ্যানমগ্ন। মানুষ কিন্তু জেগে। বিশাল শিমুলের কোটরে প্রদীপ জ্বলছে। ছায়ায় কাঁপছেন দেবতা বোঙ্গা। বসন্তের মধ্যরাতে সাঁওতালিদের পরব শুরু হয়েছে। পাথরে কোঁদা সচল নারীমূর্তি প্রদীপ হাতে চলেছে দেবস্থানে। কচি ছাগশিশু থেমে থেমে কাঁদছে। ধূপ আর ধুনোর ধোঁয়া সরু চুলের গুচ্ছের মত আকাশের দিকে উঠছে। মাদলের শব্দ ফিরে ফিরে আসছে। বসন্তের বড় আনন্দ। মানুষ এখনও তাকে চেনে। শুধু সে-ই জেগে নেই, মানুষও জেগে আছে। পাহাড়ঘেরা ছোট্টপ্রান্তর পৃথিবীব বিরাটমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলো যেখানে পড়ে না, সেখানেও প্রচারের টানে নয়, প্রাণের টানে মানুষ ছুটে এসেছে

উৎসবের সাজে। পক্ষী-শাবক মায়ের কোলের কাছে জেগে উঠেছে মাদলের শব্দে। ভাবছে এই আমার সুন্দর পৃথিবী। এরই আকাশে একদিন আমাকে ডানা মেলতে হবে। বাজ আছে। থাকুক। তার ক্ষুদ্র ডানার চেয়ে আকাশ অনেক বড়। পথ চলে গেছে দূরে, বাঙলার সীমান্ত পেরিয়ে বিহারের দিকে। শালের ডালে নতুন পাতার পদশব্দ। সারা বনভূমিতে প্রাণের আগমনের ঝিন ঝিন শব্দ। শীতের ঘুম ভেঙে সরীসৃপ এসেছে গর্তের বাইরে। মাছের মা ডিম পাড়ছে শীতল জলের কিনারায়। হরিণ শাবক জল খাচ্ছে চকচক শব্দে। সারা পৃথিবী যখন সুপ্ত তখন পাথরের গা বেয়ে কুলুকুলু করে জলধারা নেমে আসছে ক্ষুদ্র একটি জলাধারে। প্রকৃতির প্রতি কোণে কোণে যে খেলা চলেছে, মানুষ হয়তো তার সাক্ষী নয়, সাক্ষী কীটপতঙ্গ, অরণ্যজীবন, বৃক্ষশাখা, ক্ষুদ্র বনলতা। মানুষের নিদ্রা আছে। সৃষ্টির চোখে ঘুম নেই। তার মণিবন্ধে বাঁধা নেই সময়ের ঘড়ি। বসন্তে পৃথিবী বড় মোলায়েম। স্তনদায়িনী মাতার ভিজে বুকের মত।

মধ্যরাতে মালকোষে গান ধরেছিলেন শিল্পী। ভূত জাগানো রাগ। গান শেষ হবার পরও সুর ভাসছে, মধ্যগগনে দ্বিপ্রহরের চিলের মত। পূব আকাশে আলোর চিড় ধরেছে। শেষরাতের বাতাসে শীতের কঙ্কাল-আঙুলের ছোঁয়া। কে যেন দেখেছিল নদীর চরে পড়ে আছে একটি কঙ্কাল তার হাতের আঙুলে তখনও ধরা আছে একটি শাঁখার আঙটি। ঊর্ধোথিত পায়ের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে নীল একটি মাছরাঙা। স্বচ্ছ জল বাতাসের স্পর্শে বৃত্তাকারে ভেঙে ভেঙে একদা জীবনের সাক্ষী কঙ্কালটিকে জীবনের কোন্ গান শোনাতে চাইছে! সেই উষার আকাশ লক্ষ্য করে শিল্পী ধরেছেন শেষ গান, যোগিয়া রাগে। ধর্মে ইসলাম, আবাহনে মানব। সৃষ্টিকর্তাকে সুরে সুরে বলতে চাইছেন—দাতা তু হ্যায় করতার। অশ্রুসিক্ত সুর ধূপের ধোঁয়ার মত ঘুরে ঘুরে

আকাশপানে উঠছে। ফুলশয্যায় নায়কের কোলের কাছে নায়িকার খোঁপাভাঙা মাথা। রাতের রজনীগন্ধার স্তবক থেকে টুপ করে খসে পড়ল একটি ফুল। রঙ্গমঞ্চে ভেলভেটের পর্দা নামছে। প্রাচীন আয়নার সামনে যৌবনের অঙ্গরাগ তুলছেন প্রবীণ অভিনেতা। দেবদারুর শাখায় সুর তুলছে উতলা কোকিল। কোথায় সেই বসন্ত! মানুষ মেরে ফেলেছে। সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে কংক্রিটের দেয়াল তুলে।

১৭

শৃগাল অতি ধূর্ত প্রাণী। দেখতেও নেহাত খারাপ নয়। সরু ছুঁচোলো মুখ। চামরের মত ন্যাজ। অনেক বিলিতি কুকুরের চেয়ে ভালো। পুষতে ইচ্ছে করলেও পোষ মানে না। নিজের চরিত্রের গুণে আদিকাল থেকেই সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কবে একবার দ্রাক্ষাফল খাবার লোভ হয়েছিল, নাগালে এল না দেখে সেই যে বলেছিল, দ্রাক্ষাফল টক, আজও সেই উক্তি মানুষের মুখে মুখে। গাছের ডালে ঠোঁটে মাংসপিণ্ড নিয়ে কাক বসেছিল। আহা! তোমার ডাকটি কি মিষ্টি বলে, বলে, তাকে ডাকিয়ে মাংসখণ্ডটি ছিনিয়ে নিয়ে প্রমাণ করেছিল, দ্রাক্ষাফল টক বলে যতটা বৈদান্তিক হতে চেয়েছিল, ততটা বৈদান্তিক সে নয়। খাঁটি মানুষের মত তার ভেতর বেদান্ত আছে, বিষয়বুদ্ধি আছে, সুযোগ সন্ধানী, ধূর্ত, লোভী আবার পণ্ডিতও। পাঠশালা খুলে কুমীর মাতার সব কটি সন্তানকে ভোগে লাগিয়েছিল। মানুষের মতই শৃগালের কাণ্ডকারখানার শেষ নেই। শৈশবে ইংরেজী শিখতে গিয়ে সাত সকালেই তাকে খামারের পাশে মুরগীর সঙ্গে মোলাকাত করতে দেখেছিলাম। মুরগী তার বড় প্রিয় খাদ্য। মুরগী বড় মানুষেরও ভীষণ প্রিয়। মুরগীর মধ্যে মুরগী ভরে সেই মুরগীর দোলমা বানিয়ে না খেলে রাষ্ট্রনায়ক দেশের চিন্তায় তেমন জুত পেতেন না।

মুরগীর পালক ছাড়ানো শরীরে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে চারটি ডিমের কুসুম ফেটিয়ে ঢেলে দিয়ে, তাইতে অলিভ, টোম্যাটো ইত্যাদি বহু-প্রকার মালমশলা ঢেলে, রাইস স্যালাড সহযোগে উদরসাৎ করে এক নেত্রী শক্ত মুঠোয় দেশের হাল ধরেন। শৃগালের সঙ্গে মুরগীর দেখা

হয়েছিল খামারের পাশে, তার সঙ্গে আমাদের নিত্য দেখা ভোজের টেবিলে। মুরগীর ঠ্যাং ধরে সভ্য মানুষের অসভ্য টানাটানি।

মানুষের আশেপাশেই শৃগালের সংসার। শহরের বুকে প্রহরে প্রহরে তার রাত জাগা ডাক আমরা আর শুনতে পাই না ঠিকই। তবে আমাদের বুকের শ্মশানে অহরহ তার ডাকাডাকি। এক প্রশ্ন—ক্যা হুয়া, হুক্কা হুয়া। সবই ধোঁয়া। হুয়া হুয়া। যা হবার তা হয়েছে। চলছে চলবে, হচ্ছে হবে। জন্ম হবে, মৃত্যু হবে। মানুষের একটা অংশ এগোবে, আর একটা অংশ পেছবে। মা কালীর হাতে কাটা মুণ্ড ঝুলছে, তলায় হাঁ করে আছে লোলুপ শৃগাল। মানুষের লোভ, মানুষেরই রক্তপান করছে ফোঁটা ফোঁটা। জয় শিবা।

শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালাই আমাদের পাঠশালা। তুমি ধূর্ত হও, তুমি শঠ হও, প্রবঞ্চক হও, কর্তাভজা হও। বাঘের পেছনে পেছনে ঘোরো। প্রমাণ কর বাঘের শৌর্য নয়, শৃগালের ধূর্ততারই জয়জয়কার সর্বযুগে। বীরের জন্যে কফিন, একটি শ্বেতপাথরের ফলক, ইতিহাসে একটি প্যারা। ধূর্তের জন্যে সিংহাসন। সেতুর ওপর শিকার মুখে বাঘ। শৃগাল বলবে ওই দেখ জলে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। বীর ব্যাঘ্র যেই হুঙ্কার ছাড়বে শিকার অমনি শৃগালের খপ্পরে। এই তো রাজনীতি। এই তো বেঁচে থাকার নীতি। সমানে-সমানে পাঞ্জার লড়াই অতীতের বিষয়। বর্তমান চলছে—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেত'-এর নীতিতে। ধর্মের জয় কাব্যে। পাণ্ডবদের জন্যে মহাপ্রস্থান। কৌরবদের জন্যে রাজ্যপাট। সীতার জন্যে পাতালপ্রবেশ। আদর্শের পথে, ধর্মের পথে জাগতিক সুখের আশা দুরাশা। গাড়ি, বাড়ি, রাজ্যপাট, সিংহাসন শৃগালের পাঠশালে না পড়লে কব্জা করা শক্ত। জগৎকে চালাতে হলে চালু হতে হবে। অচলকে সচল করতে হবে। যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায় তাকেও ফ্যাঁস ফ্যোঁস করতে হবে।

গর্তের মধ্যে ছিল সাপ। মাঝে মধ্যেই কামড়-টামড় মারত। এক সাধু যাচ্ছিলেন সেই পথে। গর্তের সাপকে বললেন, বাপু বয়েস হচ্ছে। এখন হিংসে ভুলে অহিংস হও। সাপের মনে সাধুর উপদেশটি ধরল। সে আর ফ্যাঁস-ফ্যোঁস করে না, কামড়ায় না। যে পারে সেই এসে খুঁচিয়ে যায়। ঢিল মারে। অনেক দিন পরে সাধুর খেয়াল হল, সেই সাপটার কি হল একবার গিয়ে দেখে আসি। সাপের অবস্থা দেখে তাঁর ভীষণ করুণা হল। নির্জীব, ক্ষতবিক্ষত, দীর্ঘকাল আহার জোটেনি। তোমার এ কি অবস্থা বাপু? সাপ বললে, আপনি আমায় অহিংস হতে বলে-ছিলেন। সাধু বললেন, তা তো বলেছিলুম; কিন্তু তোমাকে তো ফ্যাঁস-ফোঁস করতে বারণ করিনি। তোমার ফোঁসটি রাখবে, তা না হলে মরবে। তার মানে ফোঁস-ধার্মিক হতে হবে। তা না হলে শয়তান মেরে পাট করে দেবে। সিংহ, বাঘ, পৃথিবীর তাবৎ খান-দানী প্রাণী সংখ্যায় ধীরে ধীরে কমে আসছে। সংরক্ষণের কড়া আইনে তাদের অবলুপ্তি ঠেকাতে হচ্ছে। শৃগালের সে ভয় নেই। শৃগাল-স্বভাবের জোরে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত তার হুক্কাহুয়া শোনা যাবে।

শেয়ালের মতই শেয়ালকাঁটা। বড় মজার গাছ। যেখানে কিছু নেই, সেখানে শেয়ালকাঁটার শোভা! চাষের প্রয়োজন নেই। অনুর্বর, রুক্ষ জমিতেই বাড়-বাড়ন্ত। ফুলেরও কী শোভা! মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কাঁটা খোঁচা হয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরু ছোঁবে না, ছাগলে চিবোবে না। কে যে নাম রেখেছিলেন শেয়ালকাঁটা! ফুল দেখলে চোখ জুড়োয়। পাতা দেখলে আতঙ্ক হয়। ভয়াবহ সুন্দরী। সহজে উপড়ে ফেলা যায় না। সর্বাঙ্গে কাঁটা। পশু না চিনুক, শৃগালের পাঠশালে পড়া মানুষ এই উদ্ভিদটিকে ঠিক চিনেছে। সেই মানুষ, যাদের কাছে পৃথিবীটা শুধু টাকার। সুদর্শন চক্রের মত সাদা টাকা, কালো

টাকা ঘুরছে। যক্ষের মত চেহারা। মেদে ঢাকা কুতকুতে মুখ। চোখে শৃগাল দৃষ্টি। তাদের পৃথিবীতে সাহিত্য নেই, বিজ্ঞান নেই, সংস্কৃতি নেই, ধর্ম নেই, আছে রাজার ছাপ মারা রাশি রাশি টাকা। যদি বলা হয়, ডক্টর খোরানা আজ বক্তৃতা দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হবে, কেতনা ভাও ? ভাও ? এ তোমার তেল নয়, চর্বি নয়, চা, চিনি, পাট নয়। লেকচার, লেকচার। তুমি কিসের কলকৌশলে এমন একটি তুমি হলে সেই কাহিনী শুনতে পাবে। ঠোঁট উলটে যাবে, রাখো ইয়ার। উসমে কেয়া হোগা ! মানুষ চাঁদে গিয়ে কি পেয়েছে ? ওখানে পাঁচতারা হোটেল খুলে ক্যাবারে নাচানো যাবে ? শেয়ালকাঁটার তেলের সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো আর সরষের তেলের গন্ধ মিশিয়ে জোড়া মহেশ মার্কা খাঁটি কড়ুয়ার তেলের কারবার খোলা যাবে ইয়ার ? নেহি। তব ? চাঁদ কি কেয়া ভাও হায় ? চাঁদের চেয়ে চাঁদি বড়। আসলের চেয়ে নকল ভালো। চায়ের জন্যে চা-বাগানের কি প্রয়োজন বন্ধু ! আমড়াতলার গলি আছে। ঘি আর মাখনের জন্যে গরু চাই ! গরু তো তুম হো। ভাগাড়ে চর্বি আছে, পাশে কেমিস্ট আছে। সোজা ফর্মুলা। এক কেজি চর্বি, পাঁচ কেজি জল, হলদে রঙ পরিমাণ মত, আর একটু সুবাস। ফেটাও। ফেটানেসে কেয়া হোগা ? মখ্খন বনেগা জী। ইনভেস্টমেন্ট পাঁচ রুপিয়া, কামাই পচাশ রুপিয়া। হুক্কা হুয়া ? কেয়া হুয়া ? কামাই হুয়া। কামাইকা বাত ছাড়া, পৃথিবীতে আর কোনও বাত নেই।

জনৈক শিল্পপতি তাঁর প্রধান রাসায়নিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এই রঙ বানাতে কি কি জিনিস লাগবে ? কেমিস্ট ভদ্রলোক মোট ষোলটি উপাদানের একটি তালিকা পেশ করলেন। শিল্পপতি হেসেই অস্থির, আরে বন্ধু, ষোলটা মাল দিয়ে এ মাল তো সবাই বানাতে পারবে। তোমাকে তাহলে এত টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছি কেন ? পাঁচ আইটেমসে এই আইটেম বানাও। কেমিস্ট

বললেন, তাত যে স্ট্যাণ্ডার্ড থাকবে না। আরে ইয়ার স্ট্যাণ্ডার্ডকা বাত ছোড়ো, কামাইকা বাত বোলো।

বেবিফুডে ভেজাল ভরে পেটি পেটি বাজারে ছাড়া হয়ে গেছে। যিনি ছেড়েছেন সেই কড়োরপতি রোজ সকালে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে কাগজের পাতা ওল্টান। কটা শিশু মরল রে বাবা! একদিন গেল, দুদিন গেল, মৃত্যুর কোন খবর নেই। এক মাস পার হয়ে গেল, জয় রামজীকি জয়! বাল লোক সব হজম কর লিয়া।

দুষ্কর্মেও রামজী, সুকর্মেও রামজী। এরই নাম মানুষ। অন্যের গলায় চাকু চালিয়ে নিজের মৃত্যুর সময় কাতর চিৎকার, প্রভু রক্ষা কর। আরও কিছুকাল বাঁচতে দাও, প্রাণ খুলে মানুষের সর্বনাশ করি। নিজের স্ত্রীকে পর্দানসীনা রেখে অন্যের স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরি। নিজে যখন বিয়ে করব তখন সতী খুঁজবো, এদিকে মনে মনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব নারীকে অসতী বানাবার মতলব। নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। এর নাম মানুষ!

ধর্মের কথা, আদর্শের কথা এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরোবে। হনুমনে দশ মণ ঘি চড়াবো ঈশ্বরকে পাবার জন্যে নয়, কামাইয়ের জন্যে। ছপ্পড় ফুঁড়ে দে মালিক। জমি কিনব, বাড়ি কিনবো, রেসের মাঠে যাবো, গরম দেখাব। ভোগের জন্যেই মন্দিরে মাথা খোঁড়া। যাগ. যজ্ঞ। নিবৃত্তির জন্যে নয়। মানুষের স্বভাব হল, ধরলেই চিঁচিঁ, ছেড়ে দিলেই তুড়ি লাফ। বিপদে পড়লে এক চেহারা, বিপদ কেটে গেলেই অন্য চেহারা।

কোনও এক রুটে নিত্য আসা যাওয়ার পথে বাসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হত। প্রায়ই তাঁকে হাত দুয়েক তফাতে রেখে আমাকে দাঁড়াতে হত। সকলের সঙ্গেই তাঁর ঠুসঠাস চলত সারাটা পথ। কোনও কোনও দিন আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করতেন, আমার পায়ে আপনার পা ঠেকল

কেন? সোজা হয়ে দাঁড়ান! ট্যাক্সি করে যান। তারপর কোনও একটা সিট খালি হলে, সকলকে টপকে মারাত্মক এক জিমন্যাসটিক দেখিয়ে ধপাস করে বসে পড়তেন। অনেক সময় এমনও হত, নিজের কায়দার সামান্য ত্রুটির জন্যে আর একজন বসে পড়েছেন, তিনি তার কোলে গিয়ে বসে পড়লেন। সারাটা পথ কোলে বসে বসেই ঝগড়া চলল। একদিন এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে, তাঁর সামনেই একটি আসন খালি হল। তিনি কিন্তু বসলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'বসুন।' 'সে কি আপনি বসুন, আপনি সামনে আছেন, আপনারই টার্ন।' অমায়িক হেসে বললেন, 'আরে বসুন, বসুন, আজ আপনি বসুন।'

বসে বসে ভাবছি, মানুষের স্বভাবের এই ভাবেই হঠাৎ পরিবর্তন হয়। রত্নাকর রাতারাতি বাল্মীকি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, হাজার বছরের অন্ধকার একটি বাতিতেই আলোকিত হয়ে যায়। মনে মনে বলছি, যাক অবশেষে আপনি তাহলে শোধরালেন! শুধরে মানুষ হলেন।

হঠাৎ ভদ্রলোক সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'বসব কি মশাই, পাছায় অ্যায়সা এক ফোড়া হয়েছে, ছটা মুখ।'

আমার সব ভাবনা উল্টে গেল। কুকুরের ন্যাজ কারুর পিতার ক্ষমতা নেই সোজা করে।

এক মাংসাশী হঠাৎ মাংসাহার ছেড়ে দিলেন। বললেন আমি অহিংস হলাম। ছাগল এসে মহাপুরুষটিকে বললে, 'সাধু, সাধু! সব মানুষই যদি আপনার মত মহানুভব হতেন!'

তিনি বললেন, 'ভয় নেই, একদিন না একদিন সকলকে হতেই হবে। দাঁত গেলে হাড় চিবোবে কি করে!'

১৮

সব জীবেরই একটা সমাজ আছে। বাঘের আছে। সিংহের আছে। পাখির আছে। কুকুরেরও আছে। সাধারণ কিছু নিয়ম তারা মেনে চলে। ঝাঁকের পাখি, ঝাঁকের মাছ কদাচিৎ নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে। ক্যানিবলিজম্ নেই বললেই চলে। বাঘে বাঘ মারে না। গোয়ালে দুটো গরু পাশাপাশি বাঁধা থাকলে রাতে একটা আর একটাকে খেয়ে ফেলে না, বা গুঁতিয়ে মেরে ফেলে না। গোয়ালের দরজা খুলে মুংলী গাই প্রতিবেশীর গোয়ালে ঢুকে ঝুমরী গাইকে বলে না, চল্ মাধুকে বাঁশ দিয়ে আসি।

মানুষ খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। ভাবতে জানে, ভাবাতে জানে। সারা পৃথিবী তার পায়ের তলায়। আকাশের দূরপ্রান্ত তার দখলে। সুচারু চেহারা। বড় বড় দাঁত নেই। নখঅলা সাংঘাতিক থাবা নেই। মানুষের গ্রন্থাগারে জ্ঞান ঠাসা বই। মগজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ। মুখে বড় বড় কথা। প্রেম, ভালবাসা, আত্মোৎসর্গ, হিতসাধন। তবু মানুষের মত অনিশ্চিত প্রাণী জীবজগতে আর দুটি নেই।

সাপ ছোবল মারবে জানা আছে। বাঘ ঘাড় মটকাবে ধরে নিতেই পারি। কাকের বাসায় খোঁচাখুঁচি করলে ঠুকরে চাঁদি ছ্যাঁদা করে দেবে, অজানা নয়। মানুষ কি করতে পারে জানা নেই। নির্জন পথে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হঠাৎ পেটে ভোজালি চেপে ধরে যাত্রীর সব কেড়ে নিতে পারে। ট্রেনের সহযাত্রী হঠাৎ সশস্ত্র ডাকাতের চেহারা নিতে পারে। ক্ষমতালোভী নেতা মায়ের কোল থেকে তার শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে ধড়, মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করতে পারে। মানুষ মানুষের হাত ধরে টেনে তুলতে পারে আবার গলায় ছুরিও চালাতে পারে।

মানুষের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে মানুষের ওপর বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসই এসে যায়। ইতিহাসের ধারায় মানুষ যত শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে ততই মানুষ সংকীর্ণ আর স্বার্থপর হয়েছে। মানুষের সমাজ বলে আর কিছু নেই। সকলেই আমরা অসামাজিক, আত্মসেবী প্রাণী। স্বার্থ ছাড়া মানুষের সম্পর্ক আজকাল আর টেঁকে না। যতদিন স্বার্থ ততদিন আসা-যাওয়া। স্বার্থের আদান-প্রদান শেষ হয়ে গেলেই আর টিকির দেখা নেই। প্রবাদটি ভারি সুন্দর ঃ কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। অমুককে ধরলে ছেলের চাকরি হতে পাবে। সকাল বিকেল আসা-যাওয়া। কুশল বিনিময়। বাড়ির কে কেমন আছে, এমনকি কুকুরটা কেমন আছে! কতই যেন হিতৈষীবন্ধু! তারপর আর পাত্তা নেই। যাকে মনে হয়েছিল মরলে খাটের সামনের দিকে কাঁধ দেবে, দেখা গেল সে বাঁশ নিয়ে তেড়ে আসছে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কালে যা ছিল এখনও তাই আছে। বরং আরও বেড়েছে। অমুকের পাড়ায় খুব হোল্ড আছে, হবু নেতার হাত এসে পড়ল একেবারে কাঁধে। ভাই সম্বোধন। নেতা যেই এম এল. এ হয়ে টাটে বসলেন, অমনি অমুক হয়ে গেল লোফার। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও স্বার্থের সম্পর্ক। প্রেম, প্রীতি, সাতপাকের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, যদিদং হৃদয়ং মম একটা মানসিক সান্ত্বনা, হ্যালুসিনেসান, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। যতদিন করতে পারবে ততদিন খাতির। স্বার্থের রোদে প্রেমের শিশির শুকোতে থাকে। শেষটা পরস্পর পরস্পরকে দন্ত প্রদর্শন করে বেঁচে থাকা। স্ত্রী আগে সরে পড়লে, বয়েস থাকলে আবার পিঁড়িতে গিয়ে বসো। স্বামী, আগে গেলে হাতড়াও বিত্ত কি পড়ে রইল। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে তবে একসেপসান ইজ নো ল। প্রচলিত প্রথা আর বিশ্বাসের তলায় নগ্ন সত্য চাপা পড়ে থাকে। সত্যপ্রকাশে মানুষের সভ্যতা এখনও লজ্জা পায়।

আমি মানুষ বড় ভালবাসি। কখন? যখন বোঝার ভারে ক্লান্ত। তখন শক্ত সমর্থ একজন মানুষ চাই। তার মাথায় মালটি তুলে দিয়ে পেছন পেছন চলো, ঝাড়া হাত-পায়ে। আমি মানুষ বড় ভালবাসি। কখন? আমার জমিতে ফসল ফলাবে কে? কে আমার গোলা ভরে দেবে! কারা আমাকে, আমার বাছাকে দুধে-ভাতে রাখবে! ক্ষেতমজুর। কে আমার উৎপাদন যন্ত্রের চাকা ঘুরিয়ে আমাকে শিল্পপতি বানাবে? দিন মজুর। আমি মানুষ বড় ভালবাসি। কখন? যখন আমার কুটোটি নাড়ার অভ্যাস থাকে না, তখন মানদা আর মোক্ষদারা আমার বড় প্রিয়। আমার এশট্যাবলিশ-মেন্টের দরজায় বন্দুকধারী মানুষ, আমি ওপরে উঠব আমার পায়ের তলায় মানুষের পিঠ। আমি তীর্থে যাব পুণ্য সঞ্চয়ে মানুষের কাঁধে চড়ে। এমনকি চিতায় চড়তে যাবো চার কাঁধে চেপে; কিন্তু মনে প্রাণে আমি চার দেয়ালের বাসিন্দা। তোমরা সবাই থাকো আমার প্রয়োজনে। তোমার প্রয়োজনে আমি নেই।

আমার জন্মের জন্যে একজন পিতা ও একজন মাতার প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধি না পাকা পর্যন্ত তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল। যেই আমার পিপুলটি পাকল তখন আমি এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। হাত খরচের টাকা না পেলে সন্তান পিতার কান কামড়ে দিতে পারে। পিতাও সন্তানের হাত কামড়ে দিতে পারে। শেষে দুজনেই হাসপাতালে। এ যুগের প্রকাশিত ঘটনা। যা প্রকাশ পায়নি তা আমরা মনে পুষছি।

সকলেরই এক বক্তব্য, আমরা এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি। সমাজ বলে আর কিছু থাকবে কি? আমরা প্রত্যেকেই উদাসীনতার শেষ সীমায় হাজির। পরস্পর মারমুখী। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে হাতাহাতি! আইনস্টাইন ঠিক এই আলোচনাই করতে গিয়েছিলেন আর এক বিখ্যাত চিন্তাবিদের সঙ্গে। আর একটি বিশ্বযুদ্ধ মানেই মানবজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস। তাতে

সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, Why are you so deeply opposed to the disappearance of the human race?

সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্যে বিজ্ঞানী অনেকাংশে দায়ী। মানুষ আর মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। তৈরী হয়েছে যন্ত্রসমাজ। দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি বেরিয়ে চলে গেছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হল মানুষও এক যন্ত্র। থিংকিং অ্যানিম্যাল। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, প্রজনন। সংখ্যায় বাড়ো। রাষ্ট্রনায়ক সৈনিক চায় প্রতিবেশী রাজ্যে হামলার জন্যে। ক্যাপিট্যালিস্ট মানুষ চায় ক্রেতা হবার জন্যে। যন্ত্রের উৎপাদন জৈব মানুষের ভোগে লাগাতে হবে, তবেই না মুনাফা! তবেই না আমার গাড়ি, বাড়ি, ফ্যান, ফোন, ফ্রিজ। সংখ্যায় বাড়ো। রাজনীতি ঝাণ্ডা তোলার মানুষ চায়। মানুষের মধ্যে জাতিভেদ না থাক ধনভেদ থাকা চাই। একের পেছনে আর এক যদি লেগে না থাকে শাসনের সহজিয়া পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়বে। নীতিটা যে, এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই। মানুষকে মানুষ দিয়েই মারতে হবে। মানুষ দিয়েই ভয় দেখাতে হবে। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা আঙুল তুলে দেখাবে, দ্যাখো দ্যাখো, কম্পালসান আর টেরার বাধ্যবাধকতা আর ভীতির কি যাদু! আমাদের শক্তি আজ কোথায় উঠেছে। সোস্যাল ডেমক্রেসি পৃথিবীতে অচল। Full intellectual growth is dependent on the foundation of open on concealed slavery।

এই বিশাল, বৈরী পৃথিবীতে মানুষ কখনই একা বাঁচতে পারবে না। জীবন একটা যৌথ প্রচেষ্টা। চাঁদির চাকতি ছুঁড়ে আলু, পটল, ঢ্যাঁড়শ পাওয়া যায় ঠিকই। সেবাও হয়তো পাওয়া যায়। তার মানে এই নয়, সামাজিক সম্ভাবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। জনপদ মধ্যরাতে যখন ঘুমে অচেতন মানুষ তখন কার ভরসায় চার দেয়ালের আশ্রয়ে পড়ে থাকে! চৌকিদার! বিজ্ঞানের যুগে কোনও কোল্যাপসিবল্ গেট, রোলিং শাটার, কি থাণ্ডার লক নিরাপত্তার

শেষ কথা নয়। তবু ঘুম আসে, স্বপ্ন আসে। কেন আসে? সেই বোধ থেকে আসে, আমি মানুষের সমাজে বাস করছি। মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি না। ভারি সুন্দর একটি ইহুদী-প্রবাদ আছে—A man can eat alone, but not work alone.

জ্ঞানের অভাব নেই তবু চিন্তাশীল মানুষ আজ একঘরে। কে কার কথা শোনে! যন্ত্রের যুগে মানুষ এক বোধশূন্য গতি। কোনও কিছুতেই আর আস্থা রাখা যায় না। সমস্ত প্রতিষ্ঠান মর্যাদা হারিয়েছে। সমস্ত ইজম খড়ের পুতুল। সমস্ত আশ্বাস এক ধরনের ভাঁওতা। পৃথিবী এখন বড় বেশি উত্তপ্ত। মানুষ যেসব বাঁধন দিয়ে পশুটিকে খাঁচায় আটকে রেখেছিল সে বাঁধন খুলে গেছে। পশ্চিমের দেহবাদ আর জড়বাদ আমাদের মগজ ধোলাই করে দিয়েছে। সংস্কৃতি মৃত। সহবত অদৃশ্য। সংকর মতবাদে মানুষ একটি ফুটো চৌবাচ্চা। মুখ দিয়ে ঢোকাও, পেছন দিয়ে বের করে দাও আর ইন্দ্রিয়ে পাখার বাতাস মারো। ও মরছে মরুক আমি তো বেঁচে আছি! দুটো হাত নিজের সেবাতেই ব্যস্ত। দুটো পা শুধু নিজের লক্ষ্য-বস্তুর দিকেই ছুটছে। চোখ দুটো নিজের ভাল ছাড়া কিছুই দেখতে পারে না। মগজ কু-চক্রে ঠাসা। এমন জীবের সমাজ থাকে কি করে! তাই যে কোনও বাড়িতে সারা রাত ধরে ডাকাতি হতে পারে। নিত্য বোমবাজি যেন মন্দিরের সন্ধ্যারতি। দশজনে ধরে একজনকে পেটাতে পারে। কেউ মাথা ঘামাবে না। গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া চলে। রামের ঘর সামলাতে শ্যামের উপদেশ পাওয়া যাবে না। শিক্ষিত মানুষ শুধু একটি কথাই বলতে শিখেছে—নান্ অফ মাই বিজনেস। আমি বেশ থাকলেই বেশ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শুধু অভিযোগ—পাড়ায় আর টেঁকা যায় না ভাই। কুকুর আর অ্যান্টি-সোস্যালস এত বেড়েছে! চতুর্দিকে করাপসান। অ্যান্টি-সোস্যালস তো আমরা সকলেই। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,

দু'জনেই তো এক শ্রেণীতে। আমরা নিজের ত্বকে ক্রিম ঘসছি, আয়নায় মুখ দেখছি, বড় বড় উপদেশ ছুঁড়ছি আর শ্যান পাগল বুঁচকি আগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমাজের ত্বকে খড়ি ফুটছে, চুল উসকো, চোখ লাল। নিজের পেটে ভিটামিন অন্যের পেটে বাতাস। এক ধরনের ধর্মও বেঁচে আছে। বাঁক কাঁধে তারকেশ্বর। কালীর মন্দিরে দীর্ঘ লাইন। হাতে চ্যাঙারি, লটকানো জবার শুঁড় দুলছে, কোণে গোঁজা ধূপ ধোঁয়া ছাড়ছে। এদিকে ভিখিরি দেখলে গৃহকর্তা তেড়ে উঠছেন। চিবিয়ে চিবিয়ে উপদেশ ঝাড়ছেন—চাকরি করতে পারো না! মহাশয় এদেশে চাকরি আছে! ক্ষমতা থাকলেও বঙ্গ সন্তানের জন্যে আপনার বুক কাঁদবে! আমি ছাড়া সবাই লোফারস, স্কাম অফ দি আর্থ।

মানুষ যতটা অমানুষ হয়েছে, অমানুষ তার চেয়ে বেশি অমানুষ হয় নি। কুকুর কুকুরই আছে। বাঘের স্বভাব বাঘের মতই আছে। মধ্যাহ্নে পাখির জটলায় ঝাঁকের ধর্ম বজায় আছে। মানুষ জানে, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ/সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং॥ ধর্ম্মো হি তেষামধিকোবিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥ তবু মানুষ যেন কেমন আচ্ছন্ন। সূর্যে গ্রহণ লেগেছে।

১৯

পুতুলের পুতুল খেলা। পৃথিবী এক তাজ্জব জায়গা। কোথা থেকে আসা কোথায় ভেসে যাওয়া! সংসারী জানে না। বিজ্ঞানী জানে না। প্রকৃত সাধক হয় তো রহস্যের সন্ধান জানেন। কিছু বলতে চান না। মুচকি হাসেন। জীবনের পাতা উল্টে যাও। দেখ না কি পাও! শেষ অধ্যায়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে যেতে পার কি-না দেখ না! হয় তো মনে হতে পারে, প্রবাস থেকে স্ব-বাসে চলেছি। আশে পাশে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে তাদের দেখে মনে হতে পারে। তোমরা কারা? কাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলুম প্রবাসজীবন! স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পরিজন, সদ্যসমাপ্ত নতুন বাড়ি, প্রিয় ঝুল বারান্দা, মাধবীলতা, কেয়ারি বাগান, আরাম কেদারা, ক্যাশ সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের পাশ বই, মেয়ে-জামাই, সব পড়ে রইল। রথ চলেছে আলোর কণা ছড়িয়ে, দূর থেকে দূরে। সংসার বিদেশ ছেড়ে মন চলেছে নিজ নিকেতনে। বিদেশীর বেশে অকারণে আর ঘুরতে হবে না।

কুছ নাহী কা নাঁর ধরি ভরসা সব সংসার।
সাচ ঝুঠ সমঝৈ নহী না কুছ কিয়া বিচার॥

কিছু না, সবই শূন্য। সেই শূন্য নিয়ে কত লড়ালড়ি। ন্যাজ তুলে দেখার অবসর হল না, এঁড়ে না, বকনা! সত্য মিথ্যার হদিশ মিলল না। বিচার! তাও করা হল না। হেগে, মুতে, চিৎকার, চেঁচামেচি করে, মাগের দাসত্ব করে, সংসারের খিদমত খেটে, নাটের গুরু অক্কা পেলেন। যাবার সময় কণ্ঠে ঘড়ঘড়ানির শব্দ। চারপাশ থেকে নানা প্রশ্ন, কি কষ্ট হচ্ছে তোমার? কিছু বলবে? কি দেখছ অমন করে? যার ছুঁচ-ফোটানো কথায় একদিন সবাই

জবলত, যার জ্ঞানের প্লাবন একদা সংসার ভাসিয়ে নিয়ে যেত, সে আজ বাক্যহারা। অসহায় দুটি হাত কাকে যেন ধরতে চাইছে! চোখ কপালে উঠে গেল। জিভ ঝুলে গেল। ইংরেজ হলে কায়দা করে বলতেন, হি হ্যাজ কিকড দি বাকেড। জীবনপাত্র উলটে দিয়ে দেনাপাওনার মানুষটি সরে পড়েছে। আর হাঁচবে না, কাশবে না, ঢেউ করে ঢেঁকুর তুলবে না। ডালে নুন কম হয়েছে বলে কারুর শ্রাদ্ধ করবে না। লালসার হাতে দেহ চটকাবে না। আর জবলবে না, জবালাবে না। ফানুসে বায়ু ঢুকে যে নাচানাচির নাম ছিল মানুষ, সেই মানুষ দাঁত ছিরকুটে পড়ে আছে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই ফুলতে থাকবে। দুর্গন্ধ ছড়াবে। সারা রাত যাকে ধরে হামলাহামলি চলত, যার অঙ্গে বেনারসী জড়িয়েছিল, গলায় দুলিয়েছিল চন্দ্রহার, যৌবনের সেই পাগল করা পাগলী নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলবে, মালটিকে এবার বিদায় করো। সংসারে টাটকা সবজিরই কদর। হাজা, মজা জিনিস অচল। মৃত কর্তার চেয়ে রজনীগন্ধার শুকনো মালাভূষিত কর্তার ছবিই ভাল। রামপ্রসাদ সার বুঝেছিলেন ঃ

দু'চারদিনের জন্য ভবে
কর্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্তারে দেবে ফেলে
কালাকালের কর্তা এসে ॥

ঈশ্বর যদি প্রশ্ন করেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র সঙ্গে করে কি নিয়ে এলে?'

'প্রভু পাঠিয়েছিলে উলঙ্গ, ফিরেও এলাম উলঙ্গ।'

'কেন বৎস, তোমার সেই তালতলার জমি! বিধবার সম্পত্তি ভোগা দিয়ে নিয়েছিলে, সেই ভূখণ্ডটি ফেলে এলে? বাঁ হাতের রোজগার ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট সেটিও রয়ে গেল, আইদার অর সারভাইভার হয়ে!'

'হ্যাঁ প্রভু। ছেলে এখন ওড়াবে। গৃহিণীর গতর বাড়বে। মুখে জর্দাপান ঠুসে পুত্রবধূর পেছনে লাগাতার লাগবে। লাগতে লাগতে একদিন ঝ্যাঁটা খাবে, তখন ধরাধরা গলায় বলবে, থাকতো সে, তাহলে কি আর এমন হতচ্ছেদ্যা করতে পারতিস তোরা? প্যান-প্যানে অশ্রু বিসর্জন। পরক্ষণেই নিজ মূর্তি ধারণ।'

'তা, এই ষাট-সত্তর বছর ধরে কি করলে মানিক। কি করে এলে? কি রেখে এলে?'

'তা হলে জগতের দিনপঞ্জীটা শুনুন। প্রথম কয়েক বছর ন্যাজে-গোবরে হয়ে পড়ে রইলুম অয়েলক্লথে। কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও দেয়ালা করি! সরষের তেল ডলে কখনও রোদে ফেলে রাখে চিংড়ি পোড়া হবার জন্যে। কখনও ছায়ায়। একদিন আদো আদো বুলি ফুটলো। দুধের দাঁত উঠল। সবাই বলতে লাগল, আহা ঈশ্বর বিরাজ করছেন ভেতরে। শিশু মানেই ভগবান। যেই দেখে সেই কোলে তুলে নিয়ে হামি খায়। আবার অসাবধানে কাপড় ভিজিয়ে দিলে শিশু ভগবানটিকে মাটিতে থেবড়ে বসিয়ে দেয়। মাঝরাতে ককিয়ে উঠলে পিতা বিরক্ত হয়ে বলেন বাঁদরটা সব আনন্দের বারোটা বাজিয়ে ছাড়লে গা। জননীর স্তন-বৃন্ত ঠোঁটের ডগায়। তখনও চুপ না করলে মধ্যরাতে ভগবানকে প্রহার। রোদন। রোদনান্তে নিদ্রা।

অতঃপর ছেলে চড়কো হল। ঈশ্বর বেরিয়ে চলে গেলেন। মানুষের পেটাই কারখানায় শুরু হল মানুষ ঢেলাই। আদো বুলি আর নেই। দুধের দাঁত ঝরে গেছে। চোখের নীলে শয়তানের ছায়া। অধিকারবোধ প্রবল। স্বার্থের আঁচ গনগনে। 'আমি'র জাগরণ। আমার জামা, আমার প্যাণ্ট, আমার পেনসিল, আমার বল, আমার বাবা, আমার মা। শিশুর বিশাল জগৎ ছোট হতে হতে, একটা পাড়া, চারটে দেয়াল, একটি পদবী, এক ধরনের অর্থনীতি, বিশেষ এক ধরনের শিক্ষা। অমুকচন্দ্র তমুক।

পিতার নাম। ঠিকানা। একটি পোস্টাপিস। নম্বর আঁটা কয়েদী।

পরীক্ষার পর পরীক্ষা। ঈশ্বর তখন পরীক্ষার্থী। গোল্লা পেলে ছাইগাদা। লেটার পেলে সিংহাসন। ঘন ঘন একই বাক্য শ্রবণ, বাপের বয়েস বাড়ছে, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি। জীবিকার শৃঙ্খলটি গলায় ঝুলিয়ে সংসারের হাল ধরো। বাপের হোটেলে আর কতকাল? দাদা থাকলে বউদির গঞ্জনা। পিতার প্রয়াণে বোনের বিবাহের ঝক্কি। ভড়ভড়িয়ে সংসারে ডুবে যাওয়া।

ঈশ্বরের এবার প্রজনন বাসনা। চুল ফিরিয়ে, টেরি বাগিয়ে মানবীর সন্ধান। প্রেমে আঁখি ঢুলু ঢুলু। লেপ্টে লেপ্টে বেড়ান। ফিরে তাকালে হৃদয়ে বিদ্যুৎচমক। না তাকালে চিরনিদ্রার বড়ি খোঁজা। অতঃপর পথ পরিষ্কার হলে ঘাটে ঘাট মিলবে। ঈশ্বরীর পিতা চাহিদা মেলাবেন, ছেলেটি কেমন? বংশ পরিচয়? চাকরি? পাকা না কাঁচা? মাইনে? ভাড়া বাড়ি, না নিজের বাড়ি? আর ভাই বোন আছে? কচলাকচলি চলতেই থাকবে। সব হিসেব মিললে একটি অর্ধাঙ্গিনী এসে পূর্ণাঙ্গ করবে।

তারপর ঈশ্বরের সরিষাফুল দর্শন। কত ধানে কত চাল, সে হিসেব তখন। সংসারের চাকায় ঈশ্বর ঘুরছেন। রোজই প্রায় এক রুটিন। ঘুম থেকে ওঠো। একটু আগে আর একটু পরে। ছোট বাজার। হলাহলি, গলাগলি, ঈশ্বরে ঈশ্বরে ঠোকাঠুকি এক ঈশ্বর পকেট খালি করে আর এক ঈশ্বরের পকেট ভরে। কম ওজনের বাটখারা, কারচুপির দাঁড়িপাল্লা, পোকাধরা বেগুন, রঙ করা পটল। এক ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে আর এক ছ্যাঁচড়ের মোলাকাত।

খড়খড়ে দাড়িতে ভোঁতা ব্লেডে জয় মা বলে এক টান। এক ঘটি জল মাথায় ঢেলেই রেশনের পিণ্ড গলাধঃকরণ। তারপর ধস্তাধস্তি করে বিধ্বস্ত অবস্থায় কর্মস্থলে গমন। সেখানে পরস্পর পরস্পরের ন্যাজ ধরে টানাটানি। কে উঠল, কে পড়ল তাই নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরা। এ একবার বড় কর্তার কান ভারি করে আসে তো, ও একবার।

সকলেরই ওপরে ওঠার জন্যে হাঁচড়-পাঁচড়। ডি-এ, টি-এর হিসেব। ইনসিওরেন্স, প্রভিডেন্ড ফান্ড, ইনকাম ট্যাক্স, প্রোফেস্যানাল ট্যাক্স। পৃথিবী তিন কিসিমের পলিটিক্সে জেরবার—পার্টি পলিটিকস, অফিস পলিটিকস আর ফ্যামিলি পলিটিকস। ঝান্ডা, লাল বাতি, স্লোগান, মিছিল। সর্বত্র গেল গেল অবস্থা। কখন কার ঘাড়ে কোপ পড়বে জানা নেই। জীবিকাচ্যুত হলেই হল। এরই মাঝে মঙ্গেশকার গান গাইছেন, হোটেলে ক্যাবারে নর্তকী পেট দেখাচ্ছেন, তেতাল্লিশ টাকার রেকর্ড কুড়ি টাকায় বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখে, বালগোপালের ননী পাড়ার ধরনে মানুষের ঘাড়ে মানুষ, তার ঘাড়ে মানুষ চেপে রেকর্ডের কোণা ধরে খামচাখামচি, আঁচড়া আঁচড়ি। এরই মাঝে দোল, দুর্গোৎসব, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, শখের থিয়েটার, বিদেশ ভ্রমণ। ওদিকে ওঁত পেতে বসে আছে, ক্যানসার, করোনারি থ্রম্বোসিস, জনডিস, হেপাটাইটিস। কেউ জল খেয়ে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় কালো হয়ে ফেটে যাচ্ছে, কেউ মাল খেয়ে সিরোসিসে টেঁসে যাচ্ছে। কেউ টাকা ওড়াবার রাস্তা পাচ্ছে না, আবার কারুর দু'বেলা হাঁড়ি চড়ছে না। কেউ সারাদিন গাছতলায় বসে প্রেম করছে, কেউ উকিল খুঁজছে বউকে তালাক দেবার জন্যে। একদিকে ঝাড়ফুঁক চলছে, আর একদিকে স্ক্যানারে মানুষের ভেতরের কলকব্জা পরীক্ষা হচ্ছে। সাধু না খেয়ে মরছে, চোরে বিরিয়ানী সাঁটাচ্ছে। চৌকিদারে চোরে হাত মেলাচ্ছে, প্রজাদের ঘরে সিঁদ পড়ছে। এর নাম পৃথিবী। মানুষ একবার লাল হচ্ছে, একবার সাদা হচ্ছে। ইতিহাসের পাতা উল্টে রাস্তা খুঁজছে, ডিকটেটার-শিপ, সোস্যালিজম, ডেমক্রেসি, কমিউনিজম —কোথায়, কিসে, কি ভাবে সুখের স্বপ্ন বাস্তব হবে। কোনও কিছুতেই কিছু হয় না। ধীরে ধীরে জীবন বুড়িয়ে আসে। চুল পড়ে যায়, চোখে চালসে। বুকে তোমার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। ডাক্তারের স্টেথো একটি জিনিসই খুঁজে পায়, ব্রংকাইটিশের কফ।

ই সি জি নেচে নেচে জানিয়ে দেয় হৃদয়বৃত্তি বড় হয়নি, বড় হয়েছে হৃদয়, খুব সাবধান। শিশু ঈশ্বর, ক্রমে পাকা মানুষ। ঝুনো মানুষ। দাও, দাও, আরো খাবো খাবো করে ঘুরছে। আদো বুলি উধাও। জননীর কোলে আর ধরে না। দেহ আকারে বেড়ে গেছে, পবিত্রতা হারিয়েছে। স্ত্রীর কোলের কাছে কুকুর-কুণ্ডলী। দামড়ার মুখে শিশুর জগৎ ভোলানো হাসি আর নেই। বাক্যে বিষ ঝরছে। চিন্তায় অন্যের সর্বনাশ ঘুরছে। হাপর অনবরতই, আমি আমি করছে আর অহঙ্কারের ফুলকি উড়ছে চারপাশে এই তোমার পৃথিবী প্রভু।'

'এর মাঝে আমার কথা কি মনে পড়েছে?'

'মনে পড়েনি বললে ভুল হবে। মানুষ তোমাকে মেরেই ফেলেছে। জ্ঞানীরা বলেন—দুর্বলের ঈশ্বর সবলের বাহুবল। তুমি তো প্রভু নোবেল প্রাইজ পাওনি! তোমাকে কে স্বীকার করবে। যে কবি লিখলেন, তাই তোমার আনন্দ আমার' পর/তুমি তাই এসেছ নীচে-/নোবেল না পাওয়া পর্যন্ত দেশের মানুষ তাঁকে চিনতে পারেনি। তুমি আছ, ইংরেজ বিজ্ঞানীর লেবরেটারিতে প্রমাণিত না হলে, তুমি নেই। তবু মনে পড়েছে। মাঘের রাতে বড় ছেলেটি যেদিন মারা গেল, সেদিন মধ্যরাতে তাকে চিতায় চাপাবার পর তোমাকে মনে পড়েছিল। তারাভরা আকাশের দিকে লকলকিয়ে উঠছে আগুনের জিভ একটি মানুষের প্রথম সন্তান পুড়ে ছাই হচ্ছে। জননীর আর্ত চিৎকারে রাত কাঁপছে, সেই সময় গঙ্গার নিশ্ছিদ্র অমা-অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে। মনে পড়েছিল সেদিন —যেদিন ডাক্তার এসে বললেন, আমার সন্দেহই ঠিক, আপনার লিভারে ক্যানসার হয়েছে। হেসে নাও। দুদিন বই তো নয়। কার যে কখন সন্ধ্যা হয়।'

২০

আমার শৈশব আবার ফিরিয়ে দাও। আমি বড় হতে চাই না। আমি ছোটই থাকতে চাই। বড়দের জগতে বড় জ্বালা। কোথায় গেল আমার সেই কল্পনার জগৎ! স্বপ্নের জগৎ! তখন আকাশ কত নীল ছিল! কত তারা ছিল! কত বিশ্বাস ছিল! তখন জীবন ঘিরে ভগবান ছিলেন। স্বর্গ ছিল আকাশের ওপারে। পাপ ছিল, পুণ্য ছিল। নির্ভরতার দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল শৈশব-জগৎ।

কি যে হয়ে গেল! কি যে হয়ে গেলুম! একটি ঝুনো নারকোল। আয়নার সামনে দাঁড়াতে ভয় করে। নিজের চোখে চোখ পড়ে গেলে ভয়ে আঁতকে উঠি। লোকটা কে! ওই কি আমার সেই আমি! চোখের সাদা অংশে আগে কেমন সমুদ্রের নীল লেগে থাকত! এখন ঘোলাটে লাল। মণিদুটোয় অদ্ভুত এক দুরভিসন্ধি থমকে আছে। কিছুক্ষণ তাকালেই মনে হয়, আমি আর আমার হাতে নেই। জগৎ আমাকে গ্রাস করেছে। আমাকে এমন অনেক কিছুই শিখিয়েছে, যা আমার শেখা উচিত ছিল না।

ব্যঙ্গের মত, উপহাসের মত আমার শৈশবের ছবি ঝুলছে দেয়ালে। ভাই বোন বসে আছি পাশাপাশি, হাতে হাত রেখে। ছবি আছে, আমরা নেই। জগতের হাটে হারিয়ে গেছি দু'জনে। নিজেরাই নিজেদের বেচে দিয়েছি। একজন হয়েছে দাস, আর একজন দাসী। দু'জনেই ভাবছি, আমরা বেশ আছি। সুখে আছি, সুন্দর আছি। আমরা কেউ কিন্তু সুখে নেই, সুন্দরও নেই। মাঝে মধ্যে দেখা হয়। করুণ হাসির বিনিময় হয়। কেমন আছিস দাদা? কেমন আছিস বোন? দু'জনেই ভাল আছি।

কেউ কাউকে ঘাঁটাতে চাই না। দুঃখ বেরিয়ে আসবে। বাবুদের বাড়ির বৈঠকখানার মত, আমাদের বাইরেটা বেশ সাজানো। এসো, বোসো, উঠে চলে যাও, অন্দরমহলে নাই বা ঢুকলে? তবু কখনও কখনও অসাবধানে, এ ওর মধ্যে ঢুকে পড়ে। বেরিয়ে আসে বিভ্রান্ত হয়ে।

শৈশব অতুলনীয়। বৈভব নেই কিন্তু প্রাচুর্যে ভরা। রাজার মত ঘোরাফেরা। সবে যার চোখ ফুটেছে, তার চোখে পৃথিবীর সব কিছুই বড় মধুর। সবুজ আরও সবুজ, নীল আরও নীল। চারপাশের মায়ায় শিশু মশগুল। কে কার দাস, কে কার প্রভু, জানার দরকার নেই। সংসার কে চালায়, কি ভাবে চলে, তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। অল্পেই সন্তুষ্ট। সামান্যই অসামান্য। দিনের পৃথিবী স্বপ্নে ভরা, রাতের পৃথিবী রহস্যে ঘেরা। সেখানে চাঁদের আলোয় পক্ষীরাজ এসে নামে রাজকন্যার ছাদে। সোনার পালঙ্কে মাথার কাছে সোনার কাঠি, পায়ের কাছে রুপোর কাঠি। শিশুর কল্পনায় তেপান্তরের মাঠ আজও আছে। শতচেষ্টাতেও সেখানে দেশলাই বাক্সের মত পাশাপাশি বাড়ি বানানো যাবে না। সে জগতে সন্ধেবেলা গাছেরা চলে বেড়ায়। হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়েও ভূতেদের কাহিল করা অসম্ভব ব্যাপার। মানচিত্রে কোথাও আর কোনও অজানা দেশ নেই। শিশুর মানচিত্রে আছে। এমন দেশ আছে যেখানে রাস্তাঘাট সব সোনার। গাছে গাছে রুপোর পাতা, হীরের ফল। পাখি কথা বলে মানুষের ভাষায়। অ্যালিস খরগোসের গর্ত দিয়ে চলে যায় আজব জগতে।

শিশুর কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া যায় না। শিশুকে রিক্ত করা যায় না। তার গলায় কৃতদাসের তাবিজ ঝোলানো যায় না। সে সম্রাট। সে স্বচ্ছন্দে রাজার টেবিলে বসে ভোজ খেতে পারে। আমি পারি না। আমার পৃথিবী শ্রেণী-বৈষম্যে ভরা। শিশু ভাবতেই পারে না, কেউ তাকে ঘৃণা করে, উপেক্ষা করে, অবহেলা.

করে। ভাবতেই পারে না, সে বড় হচ্ছে মিথ্যার পৃথিবীতে অভিনয়ের পৃথিবীতে। সে বিশ্বাস করে, সবাই তাকে ভালবাসে, সবাই তাকে আগলে রাখবে। যে কোল আদর করে তুলে নিয়েছে, সে কোল অনাদরে আর ফেলে দেবে না।

মা যেদিন হঠাৎ মারা গেলেন, সেদিন ভাই-বোন স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁর মাথার সামনে। এর নাম মৃত্যু! একেই বলে চিরকালের মত চলে যাওয়া! আমার জন্যে যে সোয়েটার বুনছিলেন, তা আর শেষ হবে না? আচারের শিশি রোজ সকালে কে রোদে দেবে! কে আবার তুলে নেবে বেলা পড়ে এলে! স্কুল থেকে ফিরে এলে কে আমাদের খেতে দেবে! রোজ রাতে কে আমাদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে দেশ-বিদেশের গল্প শোনাবে! দু'জনের কেউই আমরা বিশ্বাস করিনি, মা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। ফুল আর মালা দিয়ে সাজিয়ে মাকে যখন নিয়ে গেল, আমরা দু'জনে তখন বাড়ির রকে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছি। কে যেন বললেন, আরে বোকা! মা তো তোদের স্বর্গে গেলেন। যখনই ডাকবি তখনই আসবেন, সোনার আঁচল জড়িয়ে আগুনের শরীর নিয়ে। শিশুর বিশ্বাসে কথাটা একেবারে মিথ্যে মনে হয়নি। বড়দের চোখে ধুলো দিয়ে মাঝরাতে আমরা দু'জনে ছাদে উঠে মাকে ডাকতুম। মা এসো, তোমার আগুনের শরীর নিয়ে, সোনার শাড়ি পরে। মা ভীষণ পান খেতে ভালবাসতেন। আমার বোন খুব যত্ন করে দু' খিলি পান সেজে নিয়ে যেত। আকাশে কালপুরুষ হেলে যেত। সপ্তর্ষি নেমে যেত পশ্চিমে। কোথায় মা! কোথায় তাঁর আগুনের শরীর। ঝাঁ করে উল্কা নেমে আসত। বোন আমার শরীরের পাশে সরে আসত ভয়ে। এক সময় ক্লান্ত হয়ে তুলসী গাছের টবে খিলি দুটো রেখে, বোন আমার ধরা ধরা গলায় বলত, মা, তুমি খেও। চুন আমি মাপ করে লাগিয়েছি। তোমার জিভ পুড়ে যাবে না। ভোর না হতেই ছুটে এসে দেখতুম, খিলি দুটো আছে না নেই!

যেমন খিলি তেমনি পড়ে আছে। শিশির-বিন্দু লেগে আছে ফোঁটা ফোঁটা। বোন বলত, দ্যাখ দাদা, রাত কেমন কেঁদেছে!

মা এলেন, তবে অন্যরূপে। অন্য চেহারা, ভিন্নস্বভাব। আমরা ভাই-বোন নির্জনে বলাবলি করতুম, এ কি হল রে! মায়ের আসনে কে এসে বসল! সন্দেহের চোখে দু'জনে দূর থেকে সেই অপরিচিতাকে দেখতুম। দেখতুম ধীরে ধীরে সব কিছু কেমন তাঁর অধিকারে চলে যাচ্ছে। বড় হয়ে বুঝেছি, এর নাম সংসার, এরই নাম মানুষ। সন্তানের চেয়ে কাম বড়। স্মৃতির চেয়ে ভোগ বড়। তাজমহল ওই কারণেই পৃথিবীতে একটি।

যে ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়িতে রান্না করতেন, একদিন দুপুরে এক জোচ্চর এসে তাকে ঠকিয়ে গেল। পেতলের চাকতিকে সোনার চাকতি বলে সেই গরিব মহিলার সব সঞ্চয় ফাঁক করে উবে গেল। সেই দিনই আমরা বুঝে গেলুম, পৃথিবীর সব কিছুই নির্ভেজাল সুন্দর নয়। সব পাখিই গান গায় না, সব গাছই ছায়া লোটায় না, সব ফলই সুস্বাদু নয়। বিষ-ফলও আছে। এখন বুঝি লোভ আছে বলেই মানুষ ঠকে। অথচ লোভ এমন জিনিস যাকে কিছুতেই সংযত করা যায় না। বেড়াল এত মার খায়, তবু হেঁসেলে ঢোকে মাছ কি দুধের লোভে।

একদিন তখমাধারী, জাঁদরেল এক ভদ্রলোক আমাকে বেকায়দায় ফেলে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় শেফার্স কলমটি চুরি করে নিয়ে গেলেন। কলমটি পেয়েছিলুম পৈতেতে। ভদ্রলোক দুপুরের দিকে এসেছিলেন। বসলেন পড়ার টেবিলে, আমি তখন লিখছিলুম। গরম কাল। গ্রীষ্মের ছুটি। ঘর্মাক্ত মানুষটি স্মিত হেসে বললেন, এক গেলাস জল খাওয়াবে খোকা! দেবতার মত চেহারা। গৌর বর্ণ। খোলা কলমটি টেবিলে রেখে ভেতরে গেলুম জল আনতে। জলপানের পর বললেন, একটা পান খাওয়াবে? সামনের দোকানে গেলুম জর্দা-পান আনতে। পানপর্ব

শেষ করে শুরু হল নানা প্রশ্ন, কি পড়, কোথায় পড় ? মৃদু হাসি লেগে আছে মুখে। অবশেষে তিনি বিদায় নিলেন। জানালা দিয়ে দেখছি, লম্বা রাস্তা ধরে তিনি এগিয়ে চলেছেন রাজার মত। হঠাৎ কলমের কথা মনে পড়ল। আমার কলম ? কই টেবিলে নেই তো! তা হলে ? আমি কি ভেতরে কোথাও রেখে এসেছি। তোলপাড় করে খুঁজতে খুঁজতেই তিনি মোড় ঘুরে অদৃশ্য। সহজে যাঁকে সন্দেহ করা যায় না, তাঁর পকেটে চড়ে চলে গেল আমার প্রাণের কলম। এখন জানি, বেশ ভালই জানি, পৃথিবীতে আমরা সবাই বড় অরক্ষিত। এখন বুঝেছি, মন আর অনুভূতির চেয়ে জিনিস অনেক মূল্যবান। আমি চাই, আমার ভালো লেগেছে, যেমন করেই হোক আমাকে তা পেতে হবে। মানুষ এই ভাবেই মানুষের সম্পত্তি ধরে টানাটানি করে। এক রাজ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে আর এক রাজ্যের ওপর। অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিজের উদর পূর্তি। কলমটি চুরি যাওয়ার পর বুঝেছিলুম—পৃথিবী এমন জায়গা যেখানে চোর আর সাধুকে সহজে আলাদা করার উপায় নেই। সকালে এক বাউল আসতেন গান গাইতেন ঃ

জগতে লোক চেনা ভার মুখ দেখে
মুখে সবাই পরম বন্ধু
হৃদয় ভরা বিষ ॥

একদিন পাড়ায় হই হই কাণ্ড। এক বড়লোক তাঁর বালক ভৃত্যকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছেন। অপরাধ ? ঝুল ঝাড়তে গিয়ে ঝাড়লণ্ঠন ভেঙ্গে ফেলেছে। যাঁকে ঈশ্বর এত দিয়েছেন, তিনি একটা ঝাড়লণ্ঠনের জন্য একটি জীবনদীপ এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলেন! সেদিন অবাক হয়েছিলুম, আজ আর হই না। এখন বুঝেছি পৃথিবীতে জীবনের চেয়ে স্বার্থ বড়। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মানুষ সহজেই পশু হয়ে যেতে পারে। ভাই ভায়ের গলায় ছুরি চালাতে পারে। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে বিষ দিতে পারে।

রবার্ট ফ্রস্টের একটি লাইন মনে গেঁথে গেছে, Blood has been harder to dam back than water। বাঁধ বেঁধে জল আটকান যায়, রক্তের স্রোত অত সহজে রোকা যায় না। যুগ যুগ ধরে মানুষ মানুষকে মেরে আসছে, It will have outlet, brave and not so brave।

সেদিন সবাই বলেছিল, বড় মানুষটির খুব সাজা হবে। ফাঁসি হয়ে যাবে। কিছুই হল না। অনেক টাকায় ছেলের বাপের সঙ্গে সহজ রফা হয়ে গেল। এখন জেনে গেছি, জীবনের চেয়ে অর্থ অনেক দামী। তা না হলে পিতা কি করে কন্যাকে বেচে দেন! স্বামী কি করে স্ত্রীর হাত ধরে বেশ্যালয়ে তুলে দিয়ে আসে! মা কি ভাবে শিশুকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফুর্তি করতে ছোটে।

কত কেতাব তো লেখা হল, কত মহাপুরুষ তো এলেন আর গেলেন। সংখ্যাহীন মন্দির, মসজিদ আর কাবায় মানুষের নিত্য মাথা ঠোকাঠুকি তবু পৃথিবীর চেহারা কেন পালটায় না। আমার শৈশব তুমি ফিরিয়ে দাও। সেই সবুজ খেলার মাঠ। দু'ধারে সাদা দুই গোল-পোস্ট। সেই সব ছবির বই। ঈশপস ফেব্‌লস। কাক নুড়ি ফেলছে'একটি একটি করে জলের কলসিতে। রেশমের মত এক মাথা চুল। দু চোখ ভরা বিস্ময়। কাঁচা শালপাতা মোড়া তেঁতুলের আচার। ফিরিয়ে দাও আমার ড্যাঙ্‌গুলি, লাট্টু। দু চোখ ভরে দাও দুঃস্বপ্নহীন নিদ্রা। আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার নিষ্পাপ জীবন। আমি আর বড় হতে চাইব না।

আমার প্রার্থনা কেউ শুনবে না। গম-এ হস্তী-কা, অসদ, কিস-সে হো জুজ মর্গ ইলাজ/শমা হর রঙ্গ-মে জলতি হৈ সহর হোনে তক॥ মৃত্যু ছাড়া জীবনযন্ত্রণার আর কী ওষুধ আছে, আসাদ/ প্রদীপকে তো সবরকমের জ্বলা জ্বলতেই হবে ভোর হওয়া পর্যন্ত।

[অনুঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব]

২১

চলে যাওয়া মানেই শূন্যতা। এক সময় ছিল, এখন আর নেই। হয়তো সামান্য একটু স্মৃতি পড়ে থাকে। একটি দালানের ভগ্নাবশেষ। একটি গাছের কাণ্ড। কোনও মানুষের চলার স্মৃতি একজোড়া চপ্পল। একটি উত্তরীয়। পাখি উড়ে গেছে, গাছের তলায় একটি রঙীন পালক। দেয়ালে কালির দাগ। নিটোল একটি সংসার ছিল কোথাও! স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই-বোন, হয়তো লোমঅলা ফুটফুটে একটি কুকুর। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! সব মিলিয়ে গেল বুদ্বুদের মত। যে ঘরে পরিবারের রান্না হত, সে ঘরের উত্তরের দেয়ালে আঁকা রয়েছে ধোঁয়ার লেখা। কলকাকলি ভেসে চলে গেছে। রন্ধনের সুবাস মিলিয়ে গেছে বাতাসে। মেলায়নি ধোঁয়ার চিহ্ন। কোথাও পড়ে আছে নদীর ধারে একটি ভাঙা ঘাট, কত মানুষের স্নানের স্মৃতি নিয়ে!

কিসে আমরা ভাসছি? সময়ের স্রোতে। দানা দানা মুহূর্ত দিয়ে তৈরি সময়ের অনন্ত স্ফটিক। সময়ের কোনও শূন্যতা নেই। চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ঝরে পড়লেও, সময় অনন্ত। বর্তমান কেবলই অতীত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ কেবলই চলে আসছে বর্তমানে। যে সময় চলে গেল তার জন্যে আমাদের কোনও শূন্যতার বোধ নেই। যে সময় কাছে চলে এল তার জন্যে আমাদের তেমন কোনও অনুভূতি নেই। সন্ধে সাতটায় আমরা হাত-পা ছড়িয়ে ভাবতে বসি না, সকাল সাতটা কোথায় চলে গেল! সময় অনবরতই পেছন দিকে চলছে বলেই আমরা সামনে চলেছি। আসলে আমাদের কোনও গতি নেই। আপেক্ষিক গতিতেই কাল থেকে কালে, মহাকালে লীন হয়ে যাই। অনেকটা সিনেমার দর্শক ঠকানো কায়দা। স্থির মটোর

গাড়িতে নায়ক স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে, পাশের ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা আঁকা প্রেক্ষাপটটি একজন উল্টোদিকে টেনে নিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে গাড়ি ছুটছে সামনের দিকে।

পুরনো বাড়ির পাশে একটি নতুন বাড়ি এসে প্রমাণ করতে চায় তুমি প্রাচীন হয়েছ। সংসারে একটি শিশু এসে বলতে চায়, আমি এলুম তোমাদের যাবার সময় হল এবার। সৃষ্টির হাতে স্রষ্টা এইভাবেই মার খেয়ে চলেছে চিরকাল। old order changeth yielding place to new. সময় জীব-জগতকে যত তাড়াতাড়ি গ্রাস করে, বস্তু জগতকে তত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারে না। আমার শরীরের ত্বকে যত তাড়াতাড়ি কুঞ্চন ধরবে, আমার বাড়ির পলস্তারায় তত তাড়াতাড়ি ধরবে না। আমি চলে যাবার পরেও বাড়িটা থাকবে। হয়তো পরের আরও তিন পুরুষ সেখানে বসবাস করে যাবে। যে ভূখণ্ডের ওপর বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যাবে। হয়তো হাত পাল্টাবে, তবু থাকবে। মাঠকোটা থেকে দালানকোটা, দোতলার ওপর তিনতলা উঠবে। সিমেণ্ট রঙ ঝলসাবে শরতের রোদে। যে রোদ্দুরে আমি ফড়িং-এর নাচানাচি দেখেছি ঘাসের ডগায়, কেউ না কেউ সে নাচ দেখবে। সেই একই ভঙ্গি। আরামকেদারায় এলানো শরীর। কোলের ওপর সেই একই খবরের কাগজ। মাঝে মাঝে মেঘ ভাসা নীল আকাশের দিকে চোখ চলে যাওয়া। অন্দর-মহল থেকে ভেসে আসা সেই একই ধরনের শব্দ, রান্নার গন্ধ।

ল্যাম্পপোস্টে, টিভি অ্যাণ্টেনায় যে ঘুড়িটিকে আমি আটকে থাকতে দেখেছিলুম, ঠিক সেই রকম একটি ঘুড়ি আটকে থাকবে। পথের ওপাশে সেই একই কৃষ্ণচূড়ায় ডালপালার বিস্তার। দোয়েলের নাচানাচি। দেখা সেই এক, চোখ দুটোই যা ভিন্ন।

বর্ষা চলে গেলেও যেমন জলের স্মৃতি জমে থাকে কোথাও কোথাও, তেমনি সময় চলে গেলেও লুটানো আঁচলের মত সময়

কোথাও কোথাও পড়ে থাকে। দেয়ালের গায়ে শ্যাওলার মত বর্তমানের গায়ে লেগে থাকে অতীত। চোর-কুঠুরিতে জমা আছে সংসারের অজস্র জিনিস। কোনও কোনওটা প্রায় শতাব্দীর মত প্রাচীন। ভিক্টোরিয়ার আমলের ভাঙা চেয়ার। পেতলের বাতিদান। গিল্টি করা ছবির ফ্রেম। ছেঁড়া-খোঁড়া কিছু বই। একটি বৃহৎ আকৃতির বিধ্বস্ত বইয়ের নাম মেটাফিজিক্স। সামনের আর পেছন দিকের পাতা নেই। কীট-দষ্ট মধ্যভাগটি কালের প্রহরণ থেকে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করেছে। মার্জিনে কপিং পেনসিলে প্রপিতামহের নোট। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর এখনও স্পষ্ট। উনিশশো ছয় কি সাত সালে এক যুবক কলকাতার এক মিশনারী কলেজে বি এ ক্লাসের নোট নিয়েছিলেন। যুবক থেকে প্রৌঢ় শেষে বৃদ্ধ। অবশেষে তিরোধান। এক সময় ছিলেন, এখন আর নেই। তৃতীয় পুরুষের এক প্রবীণ নির্জন দ্বিপ্রহরে সেই বইটির পাতা ওলটাচ্ছে। সময় পিছু হাঁটতে শুরু করেছে। সামনের পিচের রাস্তা কাঁচা হয়ে গেছে। লোকসংখ্যা কমে এসেছে। আশেপাশের অনেক বাড়ি নেই। ইলেকট্রিক পোস্টের বদলে গ্যাসপোস্ট এসে গেছে। রায়-বাহাদুর সূর্য সেন আমবাগানে ট্যানা পরে বসে আছেন। থেকে থেকে হুসহাস করে কাক তাড়াচ্ছেন। স্টেট বাসের বদলে চিৎপুর দিয়ে কেরাঞ্চি গাড়ি চলেছে। পেছনের আসনে বসে আছেন পাগড়ি মাথায় কোনও ব্যানিয়ান। পালকি চড়ে বউঠান চলেছেন শ্বশুরালয়ে। পান্থিরমাঠে বসেছে স্বদেশীসভা। ইডেনের ব্যান্ডস্ট্যান্ডে বাজছে গোরা-বাদ্যি।

বইটির পাতা থেকে কলকাতার প্রাচীন এক রঙ্গালয়ের টিকিট বেরিয়ে এল। যুবক প্রপিতামহ থিয়েটার দেখেছিলেন। সে রাতের অভিনেতা কে ছিলেন! তিনি এখন কোথায়? কিন্তু আগে আর পরে দর্শক আর অভিনেতা দুজনেই কালের শিকার হয়েছেন। চোর-কুঠুরিতে সময়ের কিছু অভ্রচূর্ণ পড়ে আছে।

নিমেষে আবার বর্তমানে ফিরে আসা। অতীতের মরীচিকা অদৃশ্য। যা ছিল তা ফিরে আসে। যা ছিল না তা আর আসে কি করে! স্মৃতি পরগাছা। বর্তমানের গা বেয়ে অতীত লতিয়ে ওঠে। বর্তমান থেকে শুষতে থাকে প্রাণরস। অতীত আছে বলেই বর্তমান নিরালম্ব নয়। ভাসমান মেঘ নয়। জপের মালার মত। মুহূর্তের রুদ্রাক্ষ জীবন-জপ-মন্ত্রে ঘুরে ঘুরে আসছে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। বছরে বছর জুড়ে জীবনের সূত্র দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। এরই মাঝে যুদ্ধ, শান্তি, দেশবিভাগ, মানচিত্রের নব-বিন্যাস, নতুন দেশসীমার জন্ম, রিপাবলিক, ডিকটেটার-শিপ থেকে ডেমক্রেসি।

তবু, বর্তমান যতই চেষ্টা করুক অতীতকে একেবারে ঠেলে বের করে দিতে পারে না। অতীত সময়ের ছোট ছোট ডোবা তৈরি হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে শতাব্দী আটকে থাকে। এপাশে তিরাশি সাল বইছে ওপাশে ছয় সাল আটকে আছে গাছের ডালে ঘুড়ির মত।

দেড়শো বছরের প্রাচীন মন্দির দাঁড়িয়ে আছে আকাশের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে। অষ্ট ধাতুর ধর্ম-পতাকাটি হেলে গেছে একপাশে। মন্দির গাত্রের কারুকার্য কিছু কিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। বহুকাল বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়নি। সন্ধ্যায় ক্ষীণ তেজের একটি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। পুরোহিত একজন আছেন। বয়েসে নবীন হলেও সাজ-পোশাক প্রাচীনের মতই। আরতির ঘণ্টা বাজে টিং টিং করে কেঁদে কেঁদে। শীর্ণ একটি মানুষ কোণে বসে কাঁসর বাজায় থেমে থেমে। তার আবার একটি চোখে দৃষ্টি নেই। আর একটি পাশে চুপটি করে বসে থাকে এক বৃদ্ধা। সময় তার শরীরের সমস্ত রস শুষে নিলেও প্রাণশক্তিটি এখনও কেড়ে নিতে পারেনি। মন্দির চত্বরের বাইরে কিছু দূরে অবন মালাকারের ভিটে। তালাবন্ধ পড়ে আছে দীর্ঘকাল। বিশাল বিশাল বৃক্ষে নিশীথের বাতাস কানা-

কানি করে। কর্কশ সুরে প্যাঁচার ডাকে প্রেতেরা নড়েচড়ে ওঠে। মিত্তির বাড়ির মেজবাবু শতাব্দীর ধাপ বেয়ে বেয়ে নেমে আসেন, ফিন-ফিনে পাঞ্জাবি গায়ে, শুঁড় তোলা চটির শব্দ তুলে। দক্ষিণের চিলেকোঠায় ঝুলতে থাকে সুন্দরী মেজ বউ মনের দুঃখে। ভাঙা আস্তাবলে অদৃশ্য ঘোড়া পা ঠুকতে থাকে। উন্মাদ বড়বাবু মাঝ রাতে চাতাল থেকে তালঠুকে লাফিয়ে পড়েন কুস্তির আখড়ায়। পরনে লাল ল্যাঙোট। পালোয়ান রামখেলোয়ান বোঝাতে থাকে, বাবু এখনও ভোর হয়নি।

রাতে পৃথিবীর পরিসর বড় কমে আসে। দিন যেন মানুষের দান ফেলে দাবা খেলতে বসে। রাত এসে ছক গুটিয়ে নেয়, বোড়েরা উঠে যায় খোলে। গজ এলিয়ে পড়ে ঘোড়ার গায়ে। রাজা শুয়ে পড়ে রাণীর পাশে। মন্ত্রী চলে যায় বোড়েদের পায়ের তলায়। রাতে মানুষ চলে আসে মানুষের কাছে। অতীত সরে আসে বর্তমানে। নিদ্রার অচেতনতা এগিয়ে আনে অদৃশ্য ভবিষ্যৎ। গাছের ডালে প্রথম রাতে যা ছিল কুঁড়ি, ভোরের আলো ফোটার আগেই তা হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণ একটি স্থলপদ্ম। দিন চলে যায়। জঠরে ভ্রূণের আকার একদিনের মাপে বাড়ে। ফাঁসীর আসামী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় আরও একদিন। কারুর আসার দিন এগিয়ে আসে, কারুর যাবার দিন।

সময় পৃথিবীর সর্বত্র একতালে চলছে না। কোথাও ঘোড়ার চাল, কোথাও বলদের চাল, কোথাও স্থির। পৃথিবী কখনও জ্যোতির্ময়ী কখনও তামসী। মহামায়ার পদতলে শ্বেতশুভ্র শিব। দিন গেল, রাত এলো, সময়ের এই হল সহজ হিসেব। জন্ম আর মৃত্যু এই হল নাটকের এক একটি অঙ্ক। যা ছিল, তা একদিন নেই হবে, যা ছিল না, তা একদিন আছে হবে। শেষ হবে না কিছুই।

২২

এই শহরের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছে। আসছে অনেক ওপর থেকে। চলেছে সাগরের দিকে। সাগরে লীন না হতে পারলে নদীর শান্তি নেই। জীবনের মত। মৃত্যুর কোলে গিয়ে উঠতেই হবে। এত কোলাহল, নর্তন, কুর্দন, আস্ফালন, তেলানো, শাসানো, প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ, নাচতে নাচতে জীবন চলছে সেই একই দিকে। মৃত্যু-মহাসাগরে। নদীর দানে সাগর পবিত্র। বহু ভক্তের পদ-রজে যেমন তীর্থ। 'সাগরে সর্বতীর্থানি। আমাদের আচমনের মন্ত্রটিও ভারি সুন্দর ঃ

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী।

নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

সেই শৈশব থেকে নদীর তীরে আমার বসবাস॥ একটি পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের দিকে। এক সময় এই অঞ্চলে ছিল বড় বড় লোকের বাগানবাড়ি, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। প্রাচীন মন্দির। বিশাল বটবৃক্ষ। শিকড়ের জটলা নেমে এসেছে মহাসাধকের জটাজালের মত। রাণী রাসমণির কালীবাড়ি আর এই কালীবাড়িটি সমবয়স্ক। বারাণসীর শিল্পী একটি পাথর থেকে মায়ের দু'টি মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। একই নৌকোয় চেপে মূর্তি দুটি এসেছিল। এক মা নামলেন দক্ষিণেশ্বরে। আর এক মা নামলেন এই মন্দিরটিতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরকে পরিণত করলেন মহাতীর্থে। তাঁর লীলামৃত কথামৃত হয়ে যুগের পারে ভেসে এল পাল তোলা নৌকার মত।

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবি ভিরীড়িতং কল্মষাপহম।

এই নদীর মত আর এক প্রবাহিত নদী। একটু উজানে

হালিশহরে রামপ্রসাদ, আর একটু উজানে শ্রীচৈতন্য। এগোতে এগোতে প্রয়াগ, বারাণসী, হরিদ্বার ছাড়িয়ে একেবারে গোমুখী।

সে যুগের বাগানবাড়ির স্বতন্ত্র একটা গাম্ভীর্য ছিল। জলের কিনারা ঘেঁষে পোস্তা উঠেছে। কয়েকটি জলটুঙ্গি। এলিয়ে থাকা সবুজ একটি ভূখণ্ড। ধারে ধারে দেবদারু, কদম, শিরীষ, অর্জুন। আলো আর ছায়া মিশে জীবনমৃত্যুর মত একটা রহস্যময় পরিবেশ। দোতলায় পশ্চিমমুখো প্রশস্ত ছাদ। সামনে তর তর করে বয়ে চলেছে গৈরিক জলধারা। ওপারের আকাশ তুঁতে নীল। তারই গায়ে লেপ্টে আছে হরিত বৃক্ষ, ধূসর মন্দিরের চুড়ো।

আভিজাত্য জিনিসটাই যুগের সঙ্গে লোপাট হয়ে গেছে। মানুষ আছে তবে মানুষের আর সে চেহারা নেই। সেই হাঁটা চলার ভঙ্গি, সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গি, সেই কথাবলার ধরন। অনুচ্চ কণ্ঠ। প্রতিটি শব্দের কি ওজন! জলটুঙ্গিতে হলুদ শাড়ি পরে সুন্দরী এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, সূর্যের লাল গোলক পৃথিবীর পরপারে যাবার জন্যে পশ্চিম আকাশে নেমে এসেছে। এখুনি যেন জলস্পর্শ করবে! ছ্যাঁক করে বুঝি শব্দ হবে। ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। একসঙ্গে তিনটে পাল তুলে চলেছে মহাজনী নৌকো। জ্বলন্ত আকাশের গায়ে ছইয়ের মানুষটিকে মনে হচ্ছে কাঠকয়লার মূর্তি।

মাঝে মধ্যে হঠাৎ কোনও প্রৌঢ়ের দর্শন মিলে যেত। দুগ্ধ শুভ্র ফিনফিনে পাঞ্জাবি। দুগ্ধশুভ্র চুল। মাঝখানে সিঁথি। খাড়া নাকে এক ধরনের শেষ বেলার ঔদ্ধত্য। সামনে লোটানো কালো পাড় ধুতির কোঁচা। পায়ে বার্নিস করা জুতো। ধীর চলন অনেকটা অপগত-জোয়ার নদীর মত। ভাঁটার টান ধরেছে। সাগর ডাকছে, 'বেলা শেষ হল, আয় এবার চলে আয়। পড়ে থাক তোর ব্রুহাম গাড়ি। আস্তাবলে ওয়েলার ঘোড়া, জলটুঙ্গিতে সুন্দরী পুত্রবধূ। ঝাড়ে জ্বলে উঠুক সহস্র দীপ। ওই শোনো রাধাকান্ত জিউর মন্দিরে সন্ধারতির ঘণ্টা বাজছে টিং টিং করে। জীবন গোধূলিতে প্রস্তুত

হও, সব গরুকেই বিচরণের তৃণভূমি ছেড়ে ঘরে ফিরতে হয়।'

শনিবারের রাতে এই সব বাগানবাড়িতে আলোর মালা জ্বলে উঠত। দোতলার হল ঘরের সব জানালা খোলা। সার সার আলোকিত ঝাড়। গেটের বাইরে ছায়া ছায়া রাস্তায় দামী দামী গাড়ী। ফোর্ড, বুইক, স্টুডিবেকার, চেভ্রলে, স্ক্রাইসলার, সানবিম, অস্টিন, মরিস। পেট্রলের গন্ধে গুমোট হয়ে আছে। সালঙ্কারা মহিলারা দোতলার চওড়া বারান্দায় কখনো এসে দাঁড়াচ্ছেন, কখনও ভেতরে চলে যাচ্ছেন। হাস্নুহানার গন্ধে বাতাস মাতাল। হঠাৎ হারমোনিয়ামে ঠুমরির মুখ বেজে উঠল। চড়া পর্দায় বাঁধা তবলায় পড়ল তীক্ষ্ণ চাঁটি। বুলবুল পাখির মত গানের ছোট ছোট কলি উড়তে লাগল পিয়া বিনা ক্যায়সে রাতিয়া গুজারে। ওদিকে বটতলার কোটরে শিবলিঙ্গের মাথার ওপর মাটির প্রদীপ জ্বলছে কেঁপে কেঁপে। খড়ের চালায় কামার বধূ কাঠের আগুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত বসিয়েছে। পেছন দিক থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে উদোম শিশু ঘুম আর খিদেতে খুঁত খুঁত করছে। দেয়ালে তাদের ছায়া কাঁপছে বিশাল আকারে। নাট মন্দিরের দোতলায় আস্তানা গেড়েছেন বিন্ধ্যাচলের শৈব-সাধক। একপাশে খাড়া ত্রিশূল। নীমকাঠের কমণ্ডলু। ধুনির আগুনে মুখ টকটকে লাল। জটা পিঙ্গল বর্ণ।

নদী দু ধরনের জীবনধারাকেই প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। ভোগ আর যোগ। রাসমণির কালীবাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ গাইছেন, মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। ঠাকুর ভাবে বিভোর। ওদিকে বাঈজী নন্দলালের নাচঘরে।

এক মন্দিরের নির্জন ঘাটে প্রেমিক প্রেমিকার মুখ চুম্বন করছে। হোরমিলারের জাহাজ চলেছে বিশাল চাকায় জল কেটে কেটে যেন আলো স্বপ্ন। ওদিকে মহাশ্মশানে ধু ধু চিতা জ্বলছে। তরুণী বধূর হাতের শাঁখা ভাঙা হচ্ছে ঘাটের পইটেতে ইট দিয়ে ঠুকে

ঠ্কে। নদী আর জীবন-নদী দ্য়েরই বিচিত্র ধারা। নীলকণ্ঠ দেখে শ্নে গান বাঁধলেন, শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস কখন কি যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। এককূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে আকুলে সাজায়।

সেই সময়টায় আমি ছিল্ম না যে সময়ে চৈতন্যদেব নৌকো করে সপার্ষদ পানিহাটি থেকে এই দিকে এসেছিলেন। একটি কাঁথা ফেলে গিয়েছিলেন কাঁথাধারীর মঠে সেই সময়েও ছিল্ম না যে সময় সিরাজ ফিরছিলেন কলকাতা জয় করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেদিন একই সঙ্গে জপ আর বিষয় চিন্তায় রত জয়নারায়ণকে নৌকো থেকে নেমে এসে একটি চড় মেরেছিলেন সে দিনও আমি ছিল্ম না। কিংবা হয় তো ছিল্ম অন্য নামে, অন্য দেহে। হয় তো বসেছিল্ম ঘাটের আর একটি ধাপে, আঁজলায় গঙ্গাজল নিয়ে। স্র্য সেদিনও ডুবছিল আকাশে জবা-কুস্ম ছড়িয়ে। এই নদী ওই স্র্য আমার বহ্ জন্মের সাক্ষী। বহ্বার আমাকে প্থিবীর আলো দেখিয়েছে। অস্ত অন্ধকারে চোখের সামনে একটি দ্টি করে তারার খই ছড়িয়ে দিয়েছে। এক মায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে আরেক মায়ের কোলে ফেলেছে। এক সম্পর্ক ভেঙে আর এক সম্পর্ক গড়ে দিয়েছে। এক এক নামে এসেছি। বইতে বইতে লীন হয়ে গেছি ম্ত্যু-সাগরে ? আবার এসেছি। ম্ণ্ডকোপনিষদের শ্লোকটি মনে পড়ছে,

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সম্দ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামর্পে বিহায়।

কে বলতে পারে বার্নিয়ের যখন পিপ্লি থেকে হ্গলি আসছিলেন আমি তাঁর নৌকোতে অন্য নামে ছিল্ম কি না? ১৬৫৬ সালের কথা। তিনশো তিরিশ বছর হয়ে গেল। কোথায় বার্নিয়ের! কোথায় পিপলিপত্তন! আর আমিই বা কে! উড়িষ্যার উপকূলে, স্বর্ণরেখা নদী থেকে প্রায় ষোল মাইল দ্রে ছিল এই বিখ্যাত বন্দর। ১৬৩৪ সালে পর্তুগীজদের হটিয়ে ইংরেজরা কুঠি

স্থাপন করেছিলেন। নদীর খেয়ালে নদী সরে গেল। তাম্রলিপ্তের মত পিপলিপত্তনের গৌরবও হারিয়ে গেল। সেই আগমন-পথে বার্নিয়ের যা দেখেছিলেন আর কি তা দেখা যাবে? 'যে-নৌকায় আমি যাত্রা করেছিলাম সেটি একখানি সাত দাঁড় যুক্ত নৌকা।' সাত দাঁড়, তিন দাঁড়, দু দাঁড়, কত রকমের নৌকো ছিল। এখনও আছে। তবে যুগ একেবারে পাল্টে গেছে। ভয় আর রহস্য যেখানে যা কিছু ছিল, মানুষ আর তার যন্ত্র-দৈত্য সব শেষ করে দিয়েছে। বার্নিয়ের দেখলেন, 'বড় বড় রুই মাছের মতন মাছের ঝাঁক তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে জলের মধ্যে এক জাতীয় তিমি মাছ। মাছগুলোর কাছাকাছি নৌকো নিয়ে যেতে বললাম মাঝিদের। কাছে গিয়ে মনে হল, মাছগুলো যেন মড়ার মতন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। দু'চারটে মাছ মন্থর গতিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, আর বাকিগুলো যেন দিশাহারা বিহ্বল হয়ে প্রাণপণ লড়াই করছে আত্মরক্ষার তাগিদে। আমরা হাত দিয়েই প্রায় গোটা চব্বিশ মাছ ধরলাম এবং দেখলাম মাছগুলোর মুখ দিয়ে ব্লাডারের মতন রক্তাক্ত এক রকম কি যেন বেরিয়ে আসছে।'

অমন অদ্ভুত মাছ আমি দেখিনি। আমি ইলিশ দেখেছি। বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ ছিল ইলিশের বছর। গঙ্গার ধারে মাইলের পর মাইল টাকী, বসিরহাট, হাসনাবাদ থেকে আসা ইলশে নাওয়ের সারি। আমাদের লাফালাফির শেষ নেই। এ নৌকো থেকে ও নৌকো লাফাতে লাফাতে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠনের সারি মালার মত লুটিয়ে আছে জলের কিনারায়। হু হু উনুন জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে আগুনের ফুলকি। মাঝিদের রান্নার মশলার কড়া গন্ধ। বাঁশে বাঁশে আটকানো জিলজিলে জাল। নদী তখন বড় দয়ালু ছিল। একবার জাল ফেললেই এক কুড়ি রুপোলি মাছ। ইলিশে মানুষের আতঙ্ক ধরে গিয়েছিল। শেষে মাটিতে ইলিশ কবর দেওয়া শুরু হল।

কোথায় সেই তপসে, ভাঙড়, দাড়িঅলা কাদা চিংড়ি। পেঁয়াজের সঙ্গে শিলে বেটে ঝালদার চিংড়ির চপ।

জনপদের যত আবর্জনা, কলকারখানার পরিত্যক্ত বিষে পুণ্যতোয়া জরজর। সমুদ্র থেকে ইলিশ আর উঠে আসে না মিঠেপানির লোভে। ঈশ্বর গুপ্ত নেই তপসেও নেই। প্রাণী না থাক নদীর প্রাণ এখনও আছে। প্রবাহিতা। সময়ের জোয়ারভাঁটা খেলে। প্রাণ হরণের ক্ষমতাও আছে এই তো সেদিন এক নৌকো জীবন গ্রাস করেছে। বিসর্জিতার জন্যে পেতে রেখেছে গৈরিক বুক। লক্ষ লক্ষ উত্তাল বাহুর আঘাতে পুবপাড়ের সব বাগানবাড়ি ভাঙতে শুরু করেছে। পোস্তা খণ্ড খণ্ড। জলটুঙ্গি কাত। সেই সুন্দরী মহিলা, শুভ্র কেশ অভিজাত বৃদ্ধ সময়ের ট্রেন ধরে চলে গেছেন অন্য স্টেশনে?

ক্যালেণ্ডারে উনিশশো তিরাশি। ঘড়ির কাঁটা সহস্র কোটীবার পাক মেরেছে। পৃথিবী আরও বৃদ্ধ হয়েছে। বটবৃক্ষের আরও ঝুরি নেমেছে। শৈশবের আমি প্রৌঢ় আমি হয়ে বসে আছি ভাঙা বেদীতে। এখন আর ইলিশের চিন্তা নয়। পূর্ণ চন্দ্রের রাত। বসে আছি সেই আশায়। দেখতে চাই বার্নিয়ের যা দেখেছিলেন, চাঁদের রামধনু। 'চাঁদের বিপরীত দিকে ঠিক দিনের আলোর রামধনুর মত উদ্ভাসিত। আলো যে খুব উজ্জল সাদা তা নয়। নানা রঙের ছটা তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায়। সুতরাং আমি প্রাচীনদের চাইতে অনেক বেশি ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ দার্শনিক আরিস্ততেলের মতে, তাঁর আগের যুগের কেউ চাঁদের রামধনু চোখে দেখেনি কোনোদিন।' বহু রাত জেগেছি নদীর ধারে। নদী কখনো কাঁদে, কখনো হাসে, কখনো তার নাভিদেশ থেকে ওঁকার ধ্বনি ওঠে। নদী ডাকে, আয় চলে আয়।

—:(*):—